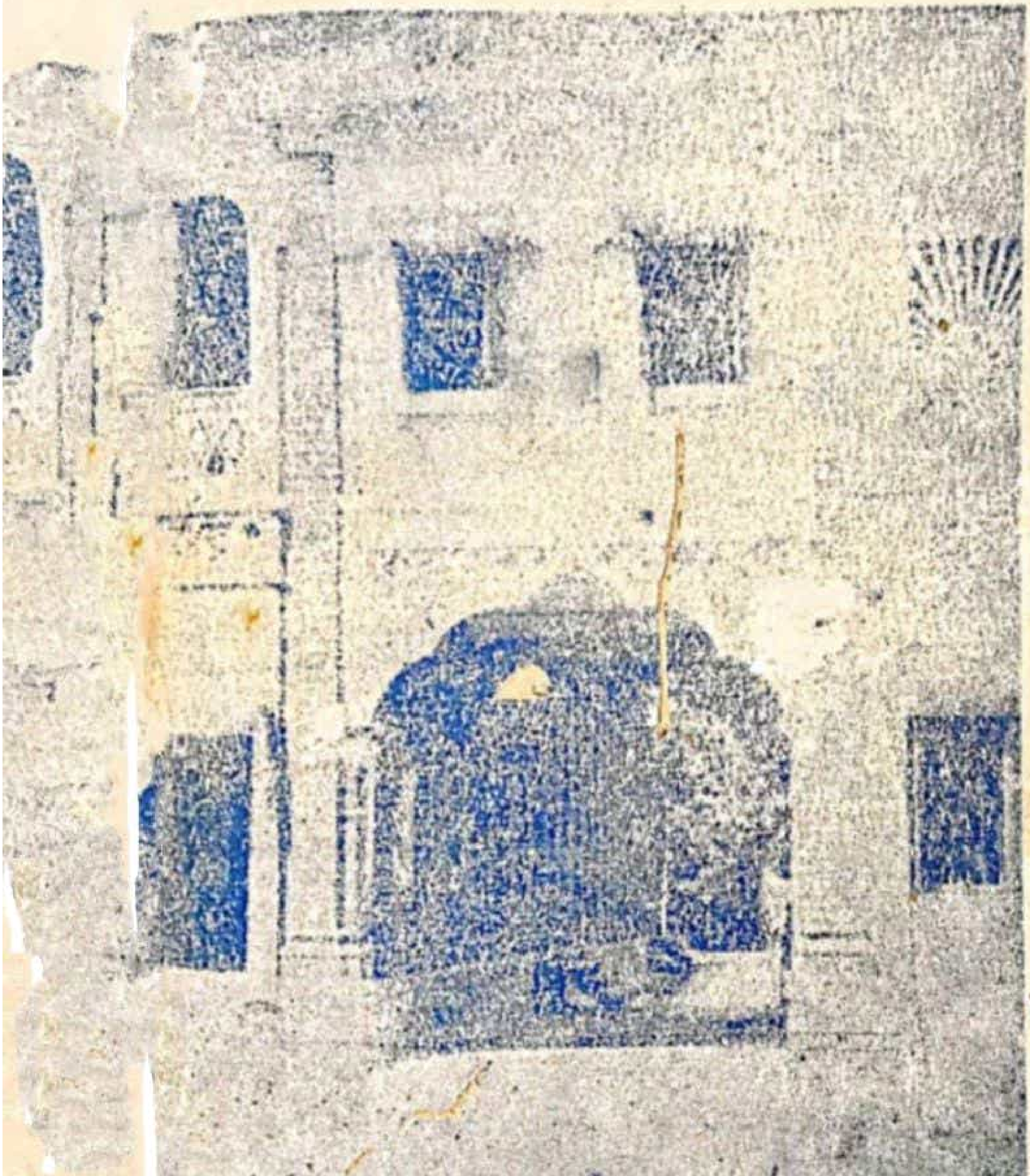
ছীরতে নেছারিয়া

দ্বিতীয় ভাগ



দারুছ্ছুন্নতের প্রধান কর্তৃক

নুরুদ্দীন আহমদ

ছীরতে নেছারিয়া

হেমায়েতে ইছলাম তহবিল প্রতিষ্ঠা

পীর ছাহেব একজন আদর্শ সংগঠক ও সমাজ সেবক ছিলেন। দেল্ যাহার সর্ব্বদা আল্লাহ্ পাকের জেকেরে মশগুল থাকিত, কি করিয়া তিনি যে সমাজের এত খেদমত আঞ্জাম দিতেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর !

পীর ছাহেবের আর একটী সমাজ সেবার অবদান হইল ইসলামকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করিবার মহান উদ্দেশ্য লইয়া হেমায়েতে ইছলাম তহবিল প্রতিষ্ঠা। এই তহবিল প্রতিষ্ঠার মূলে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস রহিয়াছে।

বাংলা ১৩৫২ সালের প্রথম ভাগ। আমরা পীর ছাহেবের সঙ্গে নিয়মিত বার্ষিক ছফরে পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত বাউফলের নিকট একটি গ্রামে গিয়াছি। সেই স্থানে একটি মহফিলের অনুষ্ঠান হয়। মহফিলে পীর ছাহেবের নিকট একটি মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা পেশ করা হইল।

এই তহবিলে সাধ্যানুযায়ী চাঁদা দান করেন। উক্ত সভায় পীর ছাহেবকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটী গঠিত হয় ও তহবিলের নাম "হেমায়েতে ইছলাম" রাখা হয়। যতদূর মনে পড়ে; পীর ছাহেবই এই নামকরণ করিয়াছিলেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্তনুযায়ী পীর ছাহেবকেই তহবিলটী গঠন ও পরিচালনের যাবতীয় দায়ীত্ব অর্পণ করা হয়। পীর ছাহেব সানন্দে এই গুরু দায়িত্বভার মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করেন এবং অর্থ দ্বারা তহবিল পুষ্ট করিবার জন্য আবেদন প্রচার করেন। পীর ছাহেবের আবেদনে তাঁহার পরম অনুগত ভক্ত মুরিদানগন বিশেষ ভাবে সাড়া দেন এবং তহবিলকে শক্তিশালী করিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করেন। প্রসঙ্গ ক্রমে পীর ছাহেবের অন্যতম প্রধান খলিফা পটুয়াখালী মহকুমা নিবাসী মাওলানা হাতেম ছাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি একাই এই তহবিলে সাত হাজারের অধিক টাকা দান করেন। পীর ছাহেবের অন্যান্য কতিপয় বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফার দানও উল্লেখযোগ্য; কিন্তু স্থানাভাবে উহা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইল না।

কয়েক বছরের মধ্যেই এই তহবিলে ত্রিশ হাজারের কিঞ্চিদধিক টাকা সঞ্চিত হয়।

তহবিলের খেদমত

যে নও মুছলিমকে উপলক্ষ্য করিয়া এই তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্র উদ্ধারের প্রচেষ্টায় প্রায় ছয় হাজার টাকা এই তহবিল হইতে ব্যয় হয়। এতদ্ব্যতীত বহু নও মুছলিমকে নিয়মিত মাসিক বৃত্তি দিয়া পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এইভাবে তহবিলের কাজ যখন সবে মাত্র অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল তখন দেশের উপর ঘিরিয়া আসিল নানা দুর্য্যোগ।

নেজামে ইছলাম কায়েম করিবার প্রতিশ্রুতি বুকে লইয়া পাকিস্তান আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ভারতীয় মুছলমানেরা তখন তকবীর নাদে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুছলিম লীগ সে আন্দোলনের কর্ণধার। পীর কেবলা ছাহেব এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

এই সময় দশ কোটী মুছলমানের নিজস্ব আবাস রচনার দাবী আদায় করিবার জন্য কেন্দ্রীয় মুছলিম লীগ প্রদেশে প্রদেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করে। উক্ত দিবসের কার্য্য-সূচী অনুযায়ী কলিকাতার মুছলমানবৃন্দ শোভাযাত্রা হরতাল প্রভৃতি পালন করিতে অগ্রসর হইলে কলিকাতার হিন্দুরা মুছলমানদের উপর হিংস্র আক্রমণ শুরু করিয়া দেয়; ফলে ভীষণ দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গায় বহু মুছলমান নিহত আহত ও নিরাশ্রয়

হইয়া পড়ে। ইহাদের সেবার জন্য মাননীয় এ. কে. ফজলুলহক ছাহেব কলিকাতায় একটী রিলিফ তহবিল গঠন করেন। পীর ছাহেব হেমায়েতে ইছলাম তহবিল হইতে উক্ত রিলিফ ফাণ্ডে মবলগ পাঁচশত টাকা সাহায্য প্রেরণ করেন।

বিহারের দাঙ্গায় হেমায়েতে ইছলামের দান

তারপর ঘটিল বিহারের মর্ম্মান্তিক দাঙ্গা। সহস্র সহস্র মুছলমান সেই নৃশংস ও চরম বর্ব্বরোচিত অত্যাচারে নিহত আহত নিরাশ্রয় ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পীর ছাহেব সেই সংবাদ শ্রবণে নিদারুণ মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে দর বিগলিত ধারা প্রবাহিত হইল। তখনই শর্ষিণা দরবারস্থ জামে মসজিদে একটি সভা আহুত হইল। পীর ছাহেব করুণ আর্ত্তনাদ সহকারে বিপন্ন মুছলমানদের মুক্তির জন্য দোওয়া করিলেন।

শুধু দোওয়া করিয়াই পীর ছাহেব নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন না। সত্যকারের একজন বিশ্ব প্রেমিক এবং বিপন্নের বন্ধু হিসাবে তিনি বিহারের নির্য্যাতিত ভাই দিগকে সক্রিয় সাহায্য করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। সেইজন্য অর্থ এবং স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। পীর ছাহেবের অনুমতি ক্রমে শর্ষিণা মাদ্রাছার ছাত্র শিক্ষক এবং দরবারের

অন্যান্য কর্ম্মীগণ চতুর্দ্দিকে বাহির হইয়া সভা সমিতির মারফত এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে পূর্ব্ববঙ্গকে আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অর্থ সংগ্রহ করতঃ পীর ছাহেবের দরবারে হাজির করিলেন। এইরূপে সঞ্চিত অর্থের সহিত হেমায়েতে ইছলাম তহবিলের টাকা যুক্ত করিয়া সর্ব্বমোট তিন হাজার টাকা সহ পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবকের একটী বাহিনী বিহারে প্রেরণ করেন। বড়ো ছাহেবজাদাও এই খেদমতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন এবং বাহিনীকে কলিকাতা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসেন। উক্ত বাহিনীতে এই দীন লেখক এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন। আমরা উক্ত অর্থ সহ পাটনায় গমন করি এবং সেইস্থানের বিভিন্ন রিলিফ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করি। অতঃপর বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্ম্ম কর্ত্তাদিগের হস্তে উক্ত টাকা বণ্টন করিয়া দেই। পীর ছাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত অর্থ তাঁহারা বিশেষ যত্নের সহিত গ্রহণ করেন এবং পীর ছাহেবের সমবেদনা লাভ করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

সিলেট গনভোটে এই তহবিলের খেদমত

অতঃপর সিলেটের গনভোট আসিল। পাকিস্তান অর্জ্জনের ইহাও ছিল একটি জেহাদ। পীর কেবলা এই জেহাদে মুজাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সুদূর ঘুমন্ত পল্লীর বুকে

একজন পীরের হাতে এইবার গণতন্ত্রের শানিত তরবারি ঝলসিয়া উঠিল। তাঁহার প্রেরণায় বহু আলেম ওলামাও কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সহস্র ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেন।

সেখানে শুধু হিন্দু নয়, কংগ্রেসি মুছলমানগণও স্থানীয় নিরীহ জনসাধারণের সম্মুখে রজত মরিচিকা জাল বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের পক্ষে ভোট প্রদান করিতে প্রলুব্ধ করিতেছিলেন। জাতির এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে পীর ছাহেব তদীয় বড় ছেলে জনাব মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ্ ছাহেবকে একটী বাহিনীর ইমাম নিযুক্ত করিয়া সিলেট প্রেরণ করেন। এই বাহিনী সিলেট জেলার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মুছলমানদিগের ঘরে ঘরে যাইয়া কখনও বা সভা সমিতির আয়োজন করিয়া মুছলিম লীগকে ভোট প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। সিলেট জেলার অধিবাসীগণ স্বভাবতঃই ধর্ম্ম প্রাণ, পীর ছাহেবের আবেদনে তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সাড়া দেন এবং খোদার রহমতে সিলেট রেফারেণ্ডামে মুছলিম লীগ জয়ী হয়। আটজন স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা এই বাহিনী গঠিত ছিল। এই বাহিনীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিল হেমায়েতে ইছলাম তহবিল।

পাকিস্তান অর্জ্জিত হইবার পরই হেমায়েতে ইছলাম কমিটীর উদ্যোগে পীর ছাহেব একটী বিরাট কনফারেন্স আহ্বান করেন। নিখিল পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ ও আলেম ওলামাদের

এই বিরাট সম্মেলনের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করে হেমায়েতে ইছলাম তহবিল। শিশু পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে আহুত এই ঐতিহাসিক কনফারেন্সের বিস্তারিত বিবরণ আমরা পীর ছাহেবের রাজনৈতিক জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। ইহা ছাড়াও নোয়াখালীর প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, চট্টগ্রামস্থ কাহার পাড়ার অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি বহু সংখ্যক ছোট খাটো প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের দরুণ এই তহবিল হইতে বহু টাকা সাহায্য দান করা হয়।

হেমায়েতে ইছলাম বয়ণ শিল্প

এই তহবিলের অর্থ দ্বারা কুটীর শিল্পের উন্নতি বিধানের নিয়তে একটি বস্ত্র বয়ণ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হইয়াছিল। ইহাতে কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হয়। ৩।৪ খানা তাঁতে সাড়ী, লুঙ্গি চাদর মশারীর থান প্রভৃতি বস্ত্র তৈয়ার হইত এবং উহা মাদ্রাছার ছাত্রদের মধ্যে ও বাজারে নির্দ্দিষ্ট মুল্যে বিক্রয় করা হইত। পরে অনিবার্য্য কারণ বশতঃ উহা স্থগিত রাখা হয়।

অদ্যাবধি এই তহবিলের কার্য্য যথা রীতি অব্যাহত আছে। পীর ছাহেবের স্মৃতি বিজড়িত সমাজ জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এই তহবিলটী যাহাতে উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইহার কার্য্য ধারা বহাল রাখিতে পারে তৎপ্রতি সকলেরই উৎসাহ উদ্যম পূর্ব্বের ন্যায় অব্যাহত রহিয়াছে।

এহ্ইয়ায়ে ছুন্নৎ তহবিল

গ্রাম্য মাদ্রাছা সমুহ সাধারণতঃ অল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে; কাজেই উহাতে নানাবিধ ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রধান কারণ অর্থ নৈতিক অসচ্ছলতা। পীর ছাহেব বিভিন্ন স্থানে ছফর কালিন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলির এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ইহার সুদূর প্রসারি কুফলের বিষয় চিন্তা করিয়া প্রতিকারের বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি অনেক সময় এই প্রতিষ্ঠান গুলির স্থায়ীত্ব, উন্নতি এবং উহাতে প্রদত্ত শিক্ষার সহিত সত্যকার ইছলামী শিক্ষা সংয়োজিত করিবার বিষয় আমাদের সহিত আলোচনা করিতেন। কখনও বা গভীর আক্ষেপ সহকারে বলিতেন—"আল্লাহ্ আমাকে এমন তৌফিক দিতেন, যাতে সব মদ্রাছাহ্গুলি নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারিতাম!" সম্ভবতঃ তিনি আমাদের নিকট হইতে কোন প্রস্তাব আশা করিতেন; কিন্তু আমরা তখন হুজুরের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতামনা তাই কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেও সাহস হইত না—কেবল "জি হাঁ" ইত্যাদি বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম।

এক শীত ঋতুতে আমরা পীর ছাহেবের সঙ্গে নোয়াখালী ছফরে সঙ্গী হইলাম। বিরাট এক কাফেলা নোয়াখালী অভিমুখে চলিল। বশীকপুর গ্রাম। আলেম প্রধান স্থান। জনাব মাওলানা আবদুল্লাহ্ ছাহেবের বাড়ীতে বিরাট সভার আয়োজন। স্থলপথ। পীর ছাহেবের পালকী বহু পূর্ব্বে উক্ত গ্রামে পৌছিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান গদীনশীন পীর ছাহেব এবং আমি একটী গো-শকটে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে ছিলাম; অবশেষে কিছুদূর পদব্রজে চলিয়া রাত্রে যাইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম পীর ছাহেব আমাদের অপেক্ষায় পেরেশান হইয়া চুপ চাপ্ পড়িয়া আছেন। সে দিনের জন্য সভা স্থগিত রাখা হইয়াছিল। সঙ্গীরা সকলে পৌছিলে পীর ছাহেব আশ্বস্ত হইলেন।

পীর ছাহেব আলেমগণকে বড়ো ভালবাসিতেন। একই স্থানে বহু সংখ্যক আলেম ব্যক্তির একত্র সমাবেশে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। আগন্তুক ও দর্শকবৃন্দের ভীড় জমিয়া উঠিয়াছিল। আমরা সকলেই শ্রান্ত ছিলাম তাই খাওয়ার দাওয়ার পরে সহজেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। রাত্রিটা নানাদিক দিয়া স্মরণীয় তাই আজিও মনে পড়ে; সেদিন আমরা পীর ছাহেব কেবলার সহিত একই বৈঠকখানায় এবং পাশাপাশি চৌকিতে একটি মাত্র পর্দ্দার ব্যবধান মাঝে রাখিয়া শয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। মৌঃ এমদাদ আলী ছাহেবও সেই ছফরে আমাদের সঙ্গী ছিলেন। তিনি এবং আমি একই স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পীর ছাহেব তখন তাহাজ্জুদের নামাজ শেষ করিয়াছেন কিংবা নামাজের জন্য তৈরী হইতেছেন ঠিক মনে নাই। মনে আছে, ঘুম ভাঙ্গিতেই

দেখিয়াছিলাম তিনি লোকজনের সহিত আলাপ করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি মৌঃ এমদাদ আলী ছাহেব ও আমাকে ডাক দিয়া এরশাদ ফরমাইলেন "ধরো' এই নাও, এই থলিয়ায় এক হাজার বিশ টাকা আছে। ইহা দ্বারা একটী তহবিলের বুনিয়াদ করো। মাদ্রাছা সমুহকে ছুন্নাৎ তরিকার আদর্শে গঠন করার জন্য টাকা দিলাম। সেই উদ্দেশ্যে এই টাকা কি ভাবে কাজে লাগানো যায় চিন্তা করো।"

আমরা পীর ছাহেবের দেওয়া এই গুরু দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করিলাম। পীর ছাহেব কেবলার প্রস্তাব মোতাবেক এই তহবিলের নাম রাখা হইল। এহ্ইয়ায়ে ছুন্নৎ তহবিল।

দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম বটে, কিন্তু এই সামান্য অর্থ দ্বারা হাজার হাজার মাদ্রাছায় কি করিয়া ছুন্নতি শিক্ষা চালু করা যায় তাহা ভাবিয়া কোন কুল কিনারা করিতে পারিলাম না। শর্ষিনা মাদ্রাছার জন্য জনসাধারণের নিকট চাঁদা প্রার্থনা করা হয়, আবার এই প্রকার নূতন চাঁদার জন্য জনসাধারণের নিকট হাত বাড়াইতে সাহস হইল না। পরে দেখিলাম; আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক চিন্তার হাত হইতে মুক্তি দিয়া পীর ছাহেব নিজেই এক মহান ত্যাগের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। যে সকল গরু বকরী, ছদকা, হাদিয়া ইত্যাদি পীর ছাহেবের জন্য আসিত তাহা তিনি নিজে ভোগ না করিয়া উহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ এই তহবিলে জমা দিতে লাগিলেন। এইরূপে তহবিল ক্রমে পুষ্ট হইতে লাগিল। পরে আমাদের নিজেদের মধ্যে বৈঠক দ্বারা

নিরক্ষর দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উক্ত তহবিলে দান করিতেন।

পীর ছাহেবের জীবন কালের ভিতর প্রায় ৫০টি মাদ্রাছা উক্ত তহবিলের সাহায্য লাভ করিয়াছে। সাহায্য প্রাপ্ত মাদ্রাছাগুলির একটি তালিকা আমরা অত্র জীবনী পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছি।

মাদ্রাছায় অধ্যয়নরত ছাত্রগণ যাহাতে দীনি এলেমের সহিত আমলের সংযোগ সাধন করিয়া সমাজে আদর্শ স্থানীয় হইয়া বাহির হইতে পারে সেই মহান উদ্দেশ্য লইয়াই পীর ছাহেব তাঁহার নিজস্ব ভোগ্য পশু সমূহ নিজের ভোগে না লাগাইয়া এই তহবিল গঠন করিয়াছিলেন। এইরূপ তহবিলের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে আরও থাকিলে, আমরা আনন্দিত হইতাম কিন্তু সম্প্রতি এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় না।

উক্ত বোর্ডের কার্য্য অদ্যাবধি খোদার ফজলে যথারীতি চলিয়া আসিতেছে।

মক্কা-মদিনা শরীফ রিলিফ তহবিল

মুছলিম জাহানের কেবলা ও কাবা, বয়তুল্লাহ্ শরীফ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে যে পবিত্র ভূমি, সেই মক্কা মোয়াজ্জমার অধিবাসীরা অধিকাংশই চির-দরিদ্র। সেই পবিত্র ভূমিতে খোদার পড়শীরা একবার আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পীর ছাহেব এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং

বিপন্নদের সাহায্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। প্রচার পত্র মারফত এই দুঃসংবাদ পীর ছাহেব দেশবাসীর দৃষ্টি গোচর করিলেন। পীর ছাহেবের আবেদনক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে প্রচুর টাকা আসিতে লাগিল। তিনি নিজেও বহু টাকা এই তহবিলে দান করিলেন। এমনকি পরিবারস্থ সকলের নিকট হাত পাতিয়া যাহা পাইলেন তাহা আনিয়া এই তহবিলে জমা করিলেন। এই ভাবে পর্য্যাপ্ত টাকা জমা হইলে মক্কা ও মদিনা শরীফে নির্দ্দিষ্ট লোকের মারফত সাহায্য প্রেরণ করা হইতে লাগিল। ইনসিওর যোগে এই টাকা প্রেরণ করা হইত। বৃটীশ আমলে বহির্ভারতে মুদ্রা প্রেরণ আইনানুসারে মাসে এক ব্যক্তির নামে এক হাজারের অধিক টাকা প্রেরণ করিবার সুযোগ ছিল না। সুতরাং প্রতি মাসে এক হাজার কখনও দুই নামে দুই হাজার টাকা প্রেরণ করা হইতে লাগিল। এই টাকায় মক্কা ও মদিনার বহু দুঃস্থ ও গরীবের প্রচুর সাহায্য হইতে লাগিল।

ক্রমান্বয়ে কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এই সাহায্যের আওতায় আসিল। তন্মধ্যে ছাওলাতিয়া মাদ্রাছা ও খায়রিয়া আরেফিয়া মাদ্রাছা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত মক্কা ও মদিনা শরীফের কতকগুলি বিশিষ্ট পরিবারকেও প্রতি মাসে নির্দ্ধারিত পরিমাণ সাহায্য প্রেরণ করা হইত।

মদিনা শরীফে শায়খোচ্ছাদাতের নামে একটি পৃথক ইনসিওর প্রেরণ করা হইত। ছৈয়দ পরিবারগণের খেদমত করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল।

তখন হেজাজের সুলতান জালালাতুল মোলক আব্দুল আজীজ এব্‌নে ছউদের সরকার একটি খাদ্য রিলিফ পরিচালন করিতেন। উক্ত তহবিলে দুই হাজার টাকা প্রেরণ করা হয়। বাদশাহ্‌ পত্রযোগে সরকারীভাবে উহার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং পত্রযোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চিঠির প্রতিকৃতি নিম্নে দেওয়া হইল।

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
ديوان جلالة الملك
الشعبة السياسية

الرقم ...
التاريخ : ... ربيع الثاني ...
التوابع ...

حضرة الفاضل مولوى نشارالدين احمد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله • وبعد فقد اطلع جلالة مولاى الملك على كتابكم الموفوع بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٩٤٢ وأمرني جلالته بابلاغكم شكره السامي على عواطفكم الطيبة وتقديره الكريم لمساعيكم •
اما فيما نتعلق بارسال التبرعات فاذا أرسلتم شيئا منها عن يد بعض الاشخاص فلامانع من اخبار الحكومة بذلك او ان ترسلوا التبرعات بواسطة لجنة الصدقات العليا بمكة المكرمه
والسلام عليكم ورحمة الله ،،،

[signature]

বাংলা ১৩৪৮ সনে এই তহবিলের কার্য্য শুরু হয় এবং ১৩৫৪

সাল পর্য্যন্ত রীতিমতো এই তহবিলের কার্য্য চালতে থাকে এই সময়ের মধ্যে প্রেরণ খরচ সহ মোট একচল্লিশ হাজার একশত টাকা চৌদ্দ আনা মক্কা ও মদিনা শরীফে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর পীর ছাহেব কেবলা হজ্জে গমন করেন এবং তহবিলের অবশিষ্ট টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। উক্ত টাকা সেই স্থানে গরীব দুঃখীদিগের মধ্যে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে বিতরণ করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত মদিনা শরীফে বাঙ্গালী মোছাফেরদের জন্য একটি মোছাফের খানা নির্ম্মাণের জন্য প্রাথমিক ভাবে দশ হাজার টাকা (বারোহাজার সাত শত রিয়াল) একটি কমিটীর মারফত রাখিয়া আসেন। বর্ত্তমানে উক্ত মোছাফেরখানা প্রতিষ্ঠার জন্য জমি খরিদ করা হইয়াছে এবং প্রাথমিক কার্য্যাদি অগ্রসর হইতেছে।

মদিনা শরীফে পীর ছাহেবের নামে একটি পানি বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়। এই পানি বিতরণ কেন্দ্রের জন্য প্রতিমাসে পৃথক টাকা প্রেরিত হইত। বয়তুল্লাহ শরীফের প্রতিবেশী এবং মদিনা শরীফের রওজা মোবারকের প্রতিবেশীগণের খেদমত করিবার ঐকান্তিক বাসনাই তাঁহাকে এই প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

পীর ছাহেবের এই কার্য্যাবলী একদিকে যেমন আল্লাহ্‌ ও তদীয় রছুলের প্রতি অগাধ ভালবাসার পরিচয় বহন করে তেমনি বহন করে বিশ্ব মুছলিম তথা বিশ্ব মানবতার প্রতি দরদ।

এমনি ভাবে পল্লীর এক নিভৃত কোণে বসিয়া বিশ্ব মুছলিমের হিতার্থে প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয় করিবার দৃষ্টান্ত খুব [illegible]।

হেদায়াতের ধারা

আলেমগণ নবাগনের উত্তরাধিকারী। ইহা একটি সর্ব্বজন বিদিত হাদিছ। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে গুরু দায়িত্ব পালন করিতে যে নবীগণ দুনিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন খুব সুখময় ছিলনা। পৃথিবীতে আল্লার বাণী প্রচার করিতে তাহাদের কি কঠোর অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহাও প্রত্যেক আলেমের জানা কথা। সেই হিসাবে নবীগণের স্থলাভিষিক্ত আলেমগণের জীবন নিরাপদ সুখে কাটিবার কথা নয়। ব্যক্তিগত আমল এবং আখলাক দ্বারা পথ ভোলা মানুষকে আকর্ষণ করিয়া আল্লাহর রাস্তায় টানিয়া আনা সহজ সাধ্য নয়। যিনি এই দায়ীত্ব পূর্ণভাবে পালন করিতে যাইবেন তাহাকে সমগ্র জীবন ব্যাপী একটি বিরাট জেহাদে লিপ্ত হইতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা পীর ছাহেব কেবলার জীবনে এই দিক দিয়া যে তৎপরতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এখন তাহারই কিছু আভাষ দিতে দিতে চেষ্টা করিব।

পীর ছাহেব কেবলা তদীয় মোরশেদ মোজাদ্দেদ-ই-জামান (রঃ) এর নির্দ্দেশে হেদায়াতের জন্যই নিজেকে ছদকা করিয়াছিলেন। সারা জীবন ব্যাপী তিনি সেই দায়ীত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি দানি এলম শিক্ষা দানের জন্য নিজ বাড়ীতে এবং প্রদেশের অন্যত্র বহু মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহাছাড়া তিনি নিজে বয়স্কদের

শরিয়ত ও মারেফতের সম্বন্ধে তা'লীম দিতেন। বিভিন্নস্থানে ছফর ও ওয়াজ নছিহতের ভিতর দিয়া তিনি হেদায়েতের কাজ ব্যাপকভাবে করিয়া গিয়াছেন।

পীর ছাহেব কেবলা একজন হাদী হিসাবে মশহুর হইলে জেলার ও পার্শ্ববর্ত্তীর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মহফিলের দাওয়াত আসিত। দাওয়াতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। তিনি নির্দ্দিষ্ট কার্যসূচী নিয়া বাড়ী হইতে রওয়ানা হইতেন। কার্যসূচী মোতাবেক যাহাদের দাওয়াত কবুল করা হইত তাহারা পীর ছাহেবের বাড়ীতে আসিয়া মহফিল অনুষ্ঠানের তারিখ লইয়া যাইত অথবা পত্রযোগে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইত। এই সকল দাওয়াত গ্রহণে পীর ছাহেব সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষিতার উর্দ্ধে থাকিতেন। কেহ দাওয়াত করিয়া পীর ছাহেবের উপর খুব অনুগ্রহ করিয়াছেন এরূপ মনোভাবকে তিনি বড়ো ঘৃণা করিতেন। এই জন্যই তাঁহার ছফরের আয়োজন হইত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। অর্থাৎ নিজ বজরায় পাক করিয়া খাইবার সম্পূর্ণ আয়োজন সঙ্গে লইয়া তিনি ছফরে বাহির হইতেন। হেদায়েতের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি ছফর করিতেন, একথা নিজেও স্পষ্টভাবে আমাদের বলিতেন এবং আমরাও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। অনেক স্থানে তিনি জলছা করিয়াছেন, ওয়াজ নছিহত করিয়াছেন; বহুলোক তাঁহার হাতে বাইয়াৎ হইয়াছে; কিন্তু সে সব স্থানে তিনি একগ্লাস শরবতও কবুল করেন নাই। সেগুলি আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

পীর কেবলার ছফরে বহু লোক সঙ্গী হইতেন। লেখক, বক্তা, আলেম, ওয়ায়েজিন, ও মুর্ফতি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দতো থাকিতেনই, তাহা ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে বহুলোক সঙ্গে থাকিতেন। পাক করার বাবুর্চি থাকিত। নিয়মিত ভাবে দীর্ঘদিন যাঁহারা পীর ছাহেবের ছোহবতে থাকিয়া ছফরে মহফিলে ওয়াজ ন ছহতের শরীক হইয়াছেন তাহাদের কতিপয়ের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি। মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেব মাওলানা আব্দুল মজিদ ছাহেব, মাওলানা মোঃ হাফিজুদ্দিন ছাহেব, মাওলানা গোলাম রহমান ছাহেব, মাওলানা আজিজুর রহমান ছাহেব (নোয়াখালী), মাওলানা মফিজুর রহমান ছাহেব এবং এই দীন লেখক। অবশ্য সাময়িক ভাবে আরও বহুলোক ছফরে সঙ্গী হইতেন এবং কিছুদিন পীর ছাহেবের ছোহবৎ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেন। পীর ছাহেবের ছোহবতে থাকিয়া তাঁহারা তরিকা শিক্ষা করিতেন এবং আত্মগঠন করিতেন। এই শ্রেণীর লোকের ছিল সংখ্যা প্রচুর। প্রকৃতির লীলাভূমি নদীবহুল বরিশাল জেলার তরঙ্গ বিক্ষোভিত সীমাহীন [illegible] বুকে ছোট্ট একখানা বজরার মধ্যে একান্ত নিরালায় পীর ছাহেবের ছোহবত যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা সত্যই সৌভাগ্যবান। উত্তর জীবনে তাঁহাদের অনেকেই সমাজের আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে দেখা দিয়াছে

[illegible] এরূপ [illegible] ছফরে বাহির হইতেন, সঙ্গে থাকিত

একটী বিরাট কুতুবখানা বা লাইব্রেরী। লেখাপড়ার সর্ব্ববিধ উপকরণ সঙ্গে যাইত। বজরায় আরোহন করিয়া প্রত্যেকটি কর্ম্মী নিজ নিজ কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। কেহই আলস্যে দিন কাটাইতে পারিতেন না। এই অমূল্য সময় ও ছোহবতকে হেলায় হারাইতেও চাহিতেন না কেউ। নদীর বুকে কোন ঝামেলা থাকিতনা; সকলেই নিবিষ্ট মনে লেখা পড়া, আলোচনা, মোরাকাবা ও মোশাহেদার সুযোগ পাইতেন। পীর ছাহেব কেবলা নিজেও লেখাপড়া কেতাব সংকলন, মছলা অনুসন্ধান ও ফতোয়া প্রনয়ণ করিবার কাজে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিতে পারিতেন। ছফর কালীন এই ভ্রমণের অংশটুকু প্রমোদ ভ্রমণ বা অসংযত আমোদ কৌতুকের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা চলিত না। পীর ছাহেব কেবলার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের দ্বারা তিনি সকলকে সম্পূর্ণরূপে নিজ আদর্শ মোতাবেক চালিত করিতেন।

নৌকার মাঝি মাল্লাগণ, সাধরণ পরিভাষায় যাহাদের বলা হয় নোকর, চাকর, খাদেম ইত্যাদি। তাহাদের সহিত মনিবের সম্পর্ক শুধু নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনের সম্পর্ক। মাঝি ঠিকভাবে অবিরাম নৌকা বাহিতেছে কি-না, বাবুর্চি ভালোভাবে খানা পাকাইতেছে কি-না, দারোয়ান সারারাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতেছে কি না; প্রভুরা শুধু তাহারই তদারক করেন এবং কার্য্যে শিথিলতা দেখিলে ধমক দ্বারা সোজা করেন। কিন্তু পীর ছাহেব কেবলার আখলাক

অনুকরণ করিয়া তাহারাও বড় হইয়া উঠিত। এমনি করিয়াই ইছলামি পরশ পাথর লৌহ কঠিন পাষাণ প্রাণে ইমানের সোনালী ফুল ফুটায়, সর্ব্বহারা-দল ফিরে পায় নব জীবন, সার্থক জীবনের পূর্ণ আশ্বাস।

পীর ছাহেব কেবলার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার আমল ও আখলাকের মধ্যে ইছলামের এই অধুনা বর্জিত রূপটী যাহারা দেখিয়াছেন, তাহাদের মস্তক আপনা হইতেই শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত হাদির মত তাহার প্রতিটি কথায় ও কাজে প্রতিধ্বনিত হইত "আম্‌রু বিল মা'রুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার।"

যাই হোক। নির্দ্দিষ্ট দাওয়াত কারীর ঘাটে আসিয়া এখন আমরা পৌছিয়াছি। আমাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া স্থানীয় দাওয়াত কারীগণ বিপুল সমারোহে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। গ্রামের ছাহেব, ছরদার, আলেম এবং সাধারণ সবাই পীর ছাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হুড় মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বজরায় তিলধানের স্থান আর নাই। আমরা জনতার চাপে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছি। অগণিত জনতার উচ্ছ্বসিত আবেগে এবং ভীড়ে পীর ছাহেবের শ্বাস রুদ্ধ প্রায়, তবুও তাঁহার চোখে মুখে একটুও বিরক্তির ছায়া পড়ে নাই। সহাস্য ও প্রশান্ত উদারতায় তিনি সকলেরই প্রাণ ভরিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতরেও একটি লক্ষানীয় বস্তু এই ছিল যে, ধনী আত্ম-গর্ব্বিত ও আত্ম-সচেতন সাক্ষাৎ প্রার্থীকে অগ্রে কথা বলিবার

সুযোগ না দিয়া ভীড়ের পাশ্চাতে যদি কোন জীর্ণ শীর্ণ দুঃস্থ গরীব কাতর নেত্রে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে সেই অবহেলিত উপেক্ষিত দর্শন প্রার্থী, যিনি অগ্রে বাড়িবার সুযোগ অথবা সাহস পান নাই তাহার প্রতি পীর ছাহেবের দৃষ্টি পড়িবা মাত্রই তাহাকে নিকটে ডাকিয়া লইয়াছেন। তাহাকে আগে বাড়িতে পথ দেওয়ার জন্য কখনও বা জনতাকে অনুরোধ করিয়াছেন। পীর ছাহেবের এই অযাচিত সুলভ ব্যবহারে সেই ভীরু কম্পিত লোকটির শুষ্ক মুখে আনন্দের হাসি ফুটিতে দেখিয়াছি। এই পক্ষপাত পূর্ণ ব্যবহারের জন্য পীর ছাহেব জনতার নিকট কৈফিয়ত দিয়াছেন "বাবারা সে গরীব! সে হয়ত মনে করিবে যে, গরীব বলিয়াই সে উপেক্ষিত হইতেছে।" কাজেই এই সমস্ত লোকের কথা তিনি আগে শুনিতেন তাহাদের সামান্যতম হাদীয়া পরম সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিতেন; সদ্য খাইবার উপযোগী হইলে উহা সমবেত জনতাকে বণ্টন করিয়া খাইতে দিতেন; রন্ধনোপযোগী হইলে বাবুর্চিকে ডাকিয়া তাহাকে লইতে বলিতেন। অপরদিকে হয়ত ধনীদের মূল্যবান হাদীয়া পড়িয়া রহিত সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিতেন না।

জনতা বিস্ময়ে কৌতুহলে পীর ছাহেবের দিকে তাকাইয়া থাকিত। এখানেও কোন হাসি তামাসা বা গল্প গজব হইতে পরিত না। তিনি সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া নিজ ছফরের উদ্দেশ্য জানাইয়া দিতেন। একমাত্র হেদায়েৎ-ই যে, তাঁহার সেই ছফরে উদ্দেশ্য তাহা তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জানাইয়া দিতেন।

অতঃপর তিনি হয়তো সংক্ষিপ্ত একতি খোৎবা দিতেন। তারপর মোনাজাত দ্বারা উহার উপসংহার করিতেন। অতঃপর দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই হাদীয়া, নজর-নেওয়াজ ইত্যাদি পীর ছাহেবের খেদমতে হাজির করিতেন। কিন্তু তাহকীক না করিয়া কোন প্রকার সন্দেহের দ্রব্য তিনি গ্রহণ করিতেন না। প্রথমে তিনি দাতার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতেন। পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে ছুন্নতের খেলাফ কিছু দেখিলে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন—"আপনার মাল বা পেশা কি হালাল? আপনি পাঁচ ওয়াক্ত রীতিমতো নামাজ পড়েন কি? আপনার বাড়ীতে শরীয়ত মোতাবেক পর্দ্দা আছে? আপনার কোনও সুদী বা কট দলীল আছে?" ইত্যাদি। ইহার যে কোনো একটী প্রশ্নের উত্তরে খট্‌কা বাঁধিলে তাহার হাদীয়া তিনি গ্রহণ করিতেন না; কিছুতেই না। কাহারও দাড়ী মুড়ানো, ছাটা কিংবা মাথার সম্মুখভাগে লম্বা চুল থাকিলে তাহার হাদীয়াও কবুল করিতেন না। ইহার ফলে, সাক্ষাৎপ্রার্থীরা নিজকৃত শরিয়তের খেলাফ কার্য্যের দরুণ একজন বোজর্গলোক দ্বারা তাহাদের হাদিয়া গৃহীত হইল না বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইতেন। তখনই তাহারা নিজ গুনাহের জন্য তওবা করিতে উদ্যত হইতেন। লম্বাচুল ওয়ালা নিজ লম্বাচুল কাটিয়া ফেলিবার জন্য তখনই স্বীকৃত হইতেন। পীর ছাহেব কেবলা নিজ ওযিফা এবং কোরআন শরীফের জুজদানের সহিত রক্ষিত কাঁচি বাহির করিয়া নিজ হাতে চুল কাটিয়া দিবেন কি-না জিজ্ঞাসা করিলে

আগন্তুক অনুতপ্ত হৃদয়ে মস্তক আগাইয়া দিতেন। পীর ছাহেব নিজ হাতে এক গোছা চুল কাটিয়া দিতেন। এমনি বহু অনুতপ্ত লোক নিজ নিজ মস্তকে সযত্নে প্রতিপালিত অশ্ব কেশর সদৃশ চুল বাহির করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিত—"হুজুর আমারও চুল কাটিয়া দিন।" ইহার পর সমবেত ভাবে পীর ছাহেব তওবা পড়াইতেন অথবা যাহারা নিজ নিজ গোনাহ হইতে ফিরিবার ওয়াদা করিয়াছে তাহাদের জন্য দুই হাত তুলিয়া দোয়া করিতেন। মাত্র ২।১ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এইসব কাণ্ড কারখানা পীর ছাহেবের বজরার মধ্যে হল কামরায় সংঘটিত হইত এবং ইহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত জনতার উপর এমন গভীরভাবে পতিত হইত যাহা প্রকাশ করিবার ভাষা মেলেনা। মনে হইত যেন, এই মানুষগুলি হঠাৎ তাহাদের চেতনা ফিরিয়া পাইয়াছে, যেন কোন এক পরশ পাথরের সংস্পর্শে তাহাদের মরচে ধরা লৌহ কঠিন প্রাণ-গুলি দ্রবিভূত হইয়া গিয়াছে; যেন তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে অন্ধকারময় এক গোপন গুহায় প্রভাতে অরুণ আলোর ছটা হঠাৎ ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে এবং সেই আলোর বন্যায় হৃদয়ের গহন গভীরে নিজকে প্রত্যক্ষ করিয়া বার বার শিহরিয়া উঠিতেছে। তওবা অথবা মোনাজাতের সময় এই অনুভূতি-গুলি আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিত; সমবেত সকলে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিত এবং আকুলি বিকুলি করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতে চাহিত।

এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের সামান্য সময়টুকুর মধ্যে এরূপ

সমগ্র গ্রামবাসী, বালক, বৃদ্ধ, যুবক এবং অন্তঃপুর বাসিনীদের প্রাণে জাগিয়া উঠিত একটী ঈদের নুতনত্ব, একটি জীবন্ত জাগ্রত প্রাণ চাঞ্চল্য। চোখে মুখে ঝলসিয়া উঠিত স্বচ্ছ নুরানী ছায়া, একটী পবিত্র জীবনের আশ্বাস। গজল গাওয়া বালকের মুখে মুখে গুঞ্জরিয়া উঠিত নব প্রভাতের ভ্রমর গুঞ্জন।

এমনি বিপুল সমারোহের ভিতর দিয়া পীর ছাহেব সভা মঞ্চে উপস্থিত হইতেন। জনতা নারায়ে তক্‌বীর ইত্যাদি ধ্বনী সহকারে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেন। কোথাও মুদ্রিত, কোথাও হস্তলিখিত মানপত্র মহফিলের পক্ষ হইতে পীর ছাহেবকে প্রদান করা হইত। পীর ছাহেব সভা মঞ্চে আরোহণ করিয়া সর্ব্ব প্রথম জনতাকে লক্ষ্য করিয়া 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলিতেন; জনতার নিকট হইতে ছালাম পাইবার প্রত্যাশা করিতেন না। মঞ্চের উপর নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিতেন এবং বলিতেন—"দেখুন! আপনাদের মধ্যে কে কে আলেম আছেন, আমি সবাইকে চিনি না, আপনারা আসুন! আমার সঙ্গে বসুন!" পরিচিত কোন আলেম ব্যক্তিকে জনতার মধ্যে দেখিতে পাইলে তিনি তাহাকে সমাদর করিয়া সঙ্গে বসাইতেন। ইহার পর মান পত্রাদির জওয়াব নিজেই দিতেন। বর্ত্তমানের প্রচলিত প্রথানুযায়ী মান পত্রাদিতে ব্যক্তিগত প্রশংসা বেশী থাকে এই জন্য মানপত্রগুলি পাঠ করিবার সময় পীর ছাহেব অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন

এবং যতবার আমি পীর ছাহেবকে মানপত্রের জওয়াব দিতে শুনিয়াছি তিনি প্রতিবারই এই হাদীছটী উল্লেখ করিয়াছেন:

উহার মর্ম্মার্থ এই—'যে ব্যক্তি নিজ প্রশংসা শুনিয়া খুশী হয়…কেয়ামতের দিনে সে বধির হইয়া উঠিবে। সুতরাং আপনারা মানপত্রে আমার যে তারিফ করিয়াছেন আমি তাহার কদাচ যোগ্য নহি, আমি বড়ই গুনাহগার। তবে আমি আপনাদের মানপত্র এই জন্য শুনিয়াছি যে, আমি মনে করিয়াছি আপনারা আমাকে দোওয়া করিয়াছেন।" ইহার পর মানপত্রে কোন বিশেষ কথা, বিশেষ প্রশ্ন অথবা আরজ থাকিলে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিতেন, কিম্বা পীর ছাহেবের পক্ষ হইতে অন্য কেহ বলিয়া দিতেন। মাদ্রাছাদির প্রাঙ্গনে সভা হইলে ছাত্রেরা গজল, নাতিয়া ইত্যাদি পাঠ করিতে চাহিলে পীর ছাহেব তাহার অনুমতি দিতেন। তবে গজল ইত্যাদি সুর ও রাগ রাগিনী যুক্ত হইলে শোধরাইয়া দিতেন কিংবা নিজেই সরল ভাবে একটি বয়াত পাঠ করিয়া সুরের নমুনা শুনাইয়া দিতেন। রাগ রাগিনী সহ গান গাওয়া বা গজল পাঠ করা যে নাজায়েজ তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিতেন। এরূপে সভার প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ওয়াজ আরম্ভ করাইয়া দিতেন। প্রায় স্থানেই সভা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আলোচ্য বিষয়ের তালিকা চাহিতেন এবং সেই তালিকা মোতাবেক ওয়াজ করাইতেন। ইমান, ইছলামের সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা, নামাজ, পরদা, হালাল রুজী, একতা, এলেম, ছুন্নতের পাবন্দ, আল্লাহ ও তদীয়

রছুলের প্রতি মোহাব্বত, আকিদা আকায়েদ, ইছলামী আদব আখলাক ও লেবাছ পোষাক ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াজ হইত। পীর ছাহেবের সঙ্গীদের মধ্যে যাহারা ওয়াজ করিতেন তাহারা পীর ছাহেবেরই শিক্ষাগুণে পারদর্শী ছিলেন। তাহাদের ওয়াজ জনতাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া দিত। একজনের পর একজন বক্তা, এক বা একাধিক বিষয়ে কোরআন, হাদীছ, যুক্তি তর্ক নানাবিধ উপমা ও ঐতিহাসিক ঘটনা সহকারে বর্ণনা করিতেন। তাহাদের বর্ণনা চাতুর্য্য, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও যুক্তির সৌন্দর্য্যে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তর দ্রবীভূত হইয়া যাইত। কখনও কখনও জনতা কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িতেন আবার কখনও উৎফুল্ল উৎসাহিত ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেন? অধিক ক্ষেত্রেই আছরের নামাজের পূর্ব্বক্ষণ হইতে শুরু করিয়া রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত ওয়াজ নছিহত চলিত। প্রায় স্থানেই পীর ছাহেব সকলের শেষে ওয়াজ করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রছুলের প্রতি মহব্বৎ, জেকের ও মোরাকাবার প্রয়োজনীয়তা, এত্তেবায়ে ছুন্নৎ এবং তাকওয়া পরহেজগারী ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াজ করিতেন। একান্ত সহজ সরল, গ্রাম্য ওপ্রাঞ্জল ভাষায় তিনি ওয়াজ করিতেন। কখনও একাধারে [illegible] তিন ঘণ্টা অবিশ্রাম ওয়াজ করিতেন! আওয়াজ গুরু গম্ভীর ছিল। জিহবার জড়তা হেতু বাক্য সমূহ একটু অস্পষ্ট, তাহাতে শ্রোতাদের বুঝিবার অসুবিধা হইত না। অতঃপর তিনি তওবার জন্য লোকদিগকে আহবান জানাইতেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিতেন—"আপনারা ইহা মনে করিবেন না যে, আমি

আপনাদিগকে আমার নিকট মুরীদ হইতে বলিতেছি। আমি একান্তই গুনাহ্‌গার। আমার গুনাহ্‌ বলার কথা আপনারা যদি সম্পূর্ণ জানিতেন তাহা হইলে আমাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেন। শুধু মুরীদ হইবার জন্যই তওবা করিতে হয় না। তওবা চারি প্রকার। "তওবায়ে মাছিয়াৎ" অর্থাৎ গুনাহের জন্য তওবা; "তওবায়ে এরাদাৎ" অর্থাৎ মুরীদ হইবার জন্য তওবা এবং "তওবায়ে তাবার্‌রুক" অর্থাৎ কোনও বোজর্গ লোকের সাক্ষাৎ পাইলে বরকত লাভের জন্য তওবা; ইত্যাদি; সুতরাং আসুন! : আমরা সকলে গুনাহের জন্য তওবা করি।"
পীর ছাহেব কেবলার এই ভাষণে সমবেত জনতার মধ্যে তওবা করিবার বিপুল আগ্রহ দেখা যাইত এবং পরস্পরে গা ঘেষাঘেষি করিয়া পরম ব্যগ্রতার সহিত হুজুরের মুখ নিঃসৃত তওবার কলেমা সমূহ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেন। জনতা যেন তাহাদের অভিপ্সিত জিনিষের সন্ধান এতক্ষণে লাভ করিয়াছেন। পীর ছাহেব কেবলা তাঁহার মস্তকে পরিহিত শুভ্র আমামার এক প্রান্ত নিজের হাতে রাখিয়া অপর প্রান্ত জনতার দিকে ছুড়িয়া দিতেন; জনতা উহাকে এমন ভাবে কাড়াকাড়ি করিয়া লুফিয়া লইত যে, একখানির পর একখানি মুষ্টিবদ্ধ হাত ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না। যাহারা পাগড়ি ধরিতে পারিতেননা; তাহাদিগকে পরস্পরে ধরাধরি করিয়া বসিতে বলা হইত। মঞ্চের উপর হইতে আরও বহু পাগড়ী জনতার দিকে নিক্ষিপ্ত হইত এবং উহার এক প্রান্ত পীর ছাহেবের পাগড়ীর সহিত, কোরতার

সহিত, কখনও হাতের মুঠিতে তুলিয়া দেওয়া হইত। এইরূপে সমগ্র মজলিছটীতে একটি গম্ভীর পরিবেশ আসন্ন হইয়া উঠিত। অতঃপর পীর ছাহেব পাঠ করিতেন—"বিছমিল্লাহির রাহমানির রহিম"। জনতা সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিতেন "বিছমিল্লাহের রাহমানের্ রহিম।" পীর ছাহেবের চক্ষু দয় বিগলিত এবং কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হইয়া উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মজলিছটী কান্নার রোলে ভাসিয়া যাইত। পীর ছাহেব জড়িত কণ্ঠে পাঠ করিতেন "আছতাগ্ ফিরুল্লাহ্ রাব্বি, মিন কুল্লে জান্‌বাও ওয়া আতুবো ইলাইহে" সঙ্গে সঙ্গে আবার বাংলায় বলিতেন—"আমি তওবা করিতেছি ছাগিরা ও কবিরাহ্ গুনাহ্ হইতে, জানিয়া করিয়া থাকি কিংবা না জানিয়া, আয় আল্লাহ তুই মাফ কর।" অতঃপর কলেমা তৈয়ব—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রছুলোল্লাহ্" একবার বা একাধিকবার পাঠ করিতেন। কখনও কলেমায়ে শাহাদৎ পাঠ করিতেন। অতঃপর বাইয়াতের বাক্যগুলি পাঠ করিতেন—"আমি বাইয়াৎ হইতেছি বিচ্ তরিকায়ে নকশ্-বন্দিয়ায়ে মোজাদ্দাদিয়া, চিশতিয়া, কাদেরিয়া আওর মোহাম্মাদিয়াকে উপর হাত ফকির, হাকীর নেছারুদ্দীন আহমদকে; জিন্‌কে পীর হজরত মাওলানা শাহ্ ছুফী হাজী গাজী মোজাদ্দিদে জামান, কুতুবোল ইরশাদ আবুবকর সিদ্দিকী।" তদীয় পীর ছাহেব কেবলার এন্তেকালের পর তাঁহার নামের শেষে "রাদি আল্লাহু আনহু" শব্দ যোগ করিতেন। মরহুমের নাম উচ্চারণ করিবার সময় পীর ছাহেব সহসা যেন স্তব্ধ হইয়া যাইতেন,

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ স্থির হইয়া থাকিতেন। কারণ, এত বেগে কান্না আসিত যে, তখন আর বাক্য স্ফুরণ হইত না। কান্নার বেগ ধারণ করিবার জন্য চুপ করিয়া থাকিতেন। কিন্তু তথাপি সশব্দে বার বার ফুঁপাইয়া উঠিতেন। চক্ষে অশ্রুর ধারা বহিয়া দাড়ি ভিজাইয়া দিত। বার বার পাগড়ীর প্রান্ত বা সঙ্গে রক্ষিত অতিরিক্ত লুঙ্গী দ্বারা চক্ষু ও সমগ্র মুখ মণ্ডল মুছিয়া লইতেন। অতঃপর সশব্দে 'আমীন' বলিয়া মোনাজাতের জন্য হাত তুলিতেন। মোনাজাতের মধ্যে মজলিছে সকল নেক কার্য্যের ছওয়াব পয়গম্বর, অলী আওলিয়া, শহীদ, ছিদ্দীক, মোজাহেদীন, তরিকার পীর মোরশেদগণ, নিজ পীর, মা-বাপ ও পৃথিবীর সমস্ত মৃত মোমেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের রুহের প্রতি বখ্‌শেশ করিতেন। ইছলামের প্রসার, ইমানের তরক্কী ও এলেমের তরক্কীর জন্য দোওয়া চাহিতেন। দেশের বালা-মুছিবৎ রদের জন্য এবং শেরেক ও বেদাৎ উৎপাটিত হইবার জন্য দোওয়া করিতেন। প্রায়ই দীর্ঘ সময় মোনাজাত করিতেন। মোনাজাতের সময় মজলিছের অবস্থা অধিকতর ব্যাকুল ও মর্ম্মস্পর্শী হইত। মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি যাইত। কেহবা আছাড়ি পিছাড়ি করিত। কাহারও ভীষণ জজ্‌বা উপস্থিত হইত। কেহবা চীৎকার করিয়া আল্লার নিকট মাগফেরাত কামনা করিত। কখনও কখনও পীর ছাহেব দুই তিনটি পৃথক পৃথক মোনাজাত করিতেন। মোনাজাতের পর সভা ভঙ্গ হইত। অতঃপর একটী দর্শনীয় ব্যাপার ঘটিত। মোনাজাতের পরে পীর ছাহেব আর তিল মাত্রও কোন সভায়

দাঁড়াইতে চাহিতেন না। তাহার প্রধান কারণ এই থাকিত যে, লোকে মনে করিতে পারে যে, পীর ছাহেব এখন কিছু হাদীয়া ও খয়রাতের প্রত্যাশা করিতেছেন। সুতরাং তিনি মোনাজাতের পরেই আসন পরিত্যাগ করিতেন এবং পালকী তৈয়ার করিবার জন্য হুকুম দিতেন। কিন্তু সহসা পালকীতে উঠা সম্ভব হইত না। জনতা প্রবল ভীড় করিয়া পীর ছাহেবকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। এমনকি ঠেলাঠেলি করিয়া লোক মঞ্চের উপর উঠিয়া যাইত। কদম বুছি, মোছাফেহা, পানি পড়ানো, ফুঁ গ্রহণ, দান-খয়রাত ইত্যাদি নানাবিধ মকছুদের আর অন্ত থাকিত না।

আবার কোন মজলিছে ওয়াজ নছিহৎ শেষ হইলে তরিকার ছবক গ্রহণকারীদের তা'লীম দান করিতেন। কখনও মাদ্রাছা ইত্যাদির বিষয় আলোচনা হইত। মাদ্রাছার স্থাপনের জন্য উৎসাহ দান করাও উহা স্থাপনের প্রণালী সমূহ বর্ণনা করা হইত। যে স্থানে পরদিন অবস্থান করিবার অবকাশ মিলিত সে স্থানে পরদিন ভোরের প্রোগ্রাম জানাইয়া দেওয়া হইত। পরের দিনে বেশীর ভাগ তরিকা তা'লীম, সংগঠনমূলক ওয়াজ নছিহত, পীর ছাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত ধর্ম্মীয় পুস্তকাদি সম্বন্ধে প্রচার, মছলা বর্ণনা ও বিচার ইনসাফ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ চলিত। এইরূপে একটী মাহ্ফিলের কাজ শেষ করিয়া আমরা পরবর্ত্তী মহাফিলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইতাম। এইভাবে মাসের পর মাস, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আমরা বিভিন্ন মহফেলের মারফত তাবলীগ করিয়া বেড়াইতাম। সাধারণতঃ পীর ছাহেবের নিজ

বাড়ীর বার্ষিক ইছালে ছওয়াব মহাফিল সম্পন্ন হইবার পর পৌষ মাসের প্রথম ভাগে আমাদের এই তাবলীগী ছফর আরম্ভ হইত এবং ক্রমাগত ছয় মাস কাল ছফরে থাকিয়া আষাঢ়ের প্রথম ভাগে কিংবা বাদল আসন্ন হইলে জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগেই ছফর শেষ করিয়া পীর ছাহেব বাড়ী ফিরিতেন। ইহার মাঝে ফাল্গুন মাসে মাদ্রাছার বার্ষিক দ্বিতীয় সভা উপলক্ষে একবার বাড়ী আসিতেন। সেই সুযোগে ফুরফুরা শরীফে নিজ পীর কেবলার বাড়ীর বার্ষিক ইছালে ছওয়াবে যোগদান করিয়া আসিতেন। আমার সুদীর্ঘ উনিশ বৎসরের সাহচর্য্য কালের মধ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই এবং কোন বৎসরই এই ছফরের প্রোগ্রাম বাদ পড়ে নাই।

এইরূপে যেখানেই একটি মহফিল হইয়াছে; সেখানেই গ্রামময় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পীর ছাহেবের অমায়িক ব্যবহার, আন্তরিক আহ্বান লোকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে! কাজেই প্রতি মহফিলে কিছু সংখ্যক লোক হেদায়েতের রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। দলে দলে লোকে বাইয়াৎ গ্রহণ করিয়াছে; জেকের ও মোরাকাবা করিতে অভ্যস্থ হইয়াছে।

আজিকার দিনে বাঙ্গলাদেশে ইছলামের চর্চ্চা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ওলামায়ে দ্বীন, মাদ্রাছা, ও ইছলামী সভা সমিতি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু পীর ছাহেব যখন হইতে হেদায়েতের কার্য্য আরম্ভ করেন তখন দেশ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইছলামী শিক্ষা দীক্ষায় লোক ছিল একেবারেই

অনভ্যস্থ। সেই নীরস উষর ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া তুলিতে পীর ছাহেব সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া হেদায়েতের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় ছিলেন একজন খাঁটী মোজাহেদ। বাঁধা বিপত্তি এবং আরাম আয়েস কোনটাই তাহাকে তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই। অসীম ধৈর্য্য অসাধারণ নিষ্ঠা, ঐকান্তিক আগ্রহ ও সীমাহীন তাওয়াক্কোল সহকারে তিনি খোদার রাহে অগ্রসর হইয়াছেন; তাই ক্রমান্বয়ে তাঁহার হেদায়েত ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়াছে। দিন দিন অগণিত লোক তাহার দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। জলন্ত প্রদীপ দেখিলে পতঙ্গ যেরূপ আত্মহারা হইয়া ঝাপাইয়া পড়ে, আল্লাহর প্রকৃত ওলী গণের দিকেও জনতা সেইরূপ ছুটীয়া আসিতে থাকে। পীর ছাহেব অতি উচ্চ স্তরের ওলী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার দিকে লোক এরূপ আকৃষ্ট হইত, যাহা দেখিলে সত্যই অবাক হইতে হইত।

ছফরের কতিপয় ঘটনা

এদেশে একশ্রেনীর আলেম কেবল অর্থের জন্যই ছফর করিতেন এবং দাওয়াতে কিংবা বিনা দাওয়াতে এক একস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। সেখানে নাম মাত্র কিছু ওয়াজ নছিহত করিয়া নির্ব্বিচারে সকলের প্রদত্ত হাদীয়া ও খয়রাৎ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেন। ইহাতে প্রকৃত হাদীগণের হেদায়াত করা

কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, শরীয়ত বিরোধী লোকের নিকট হইতে হাদীয়া গ্রহণ কিংবা তাহার দাওয়াত কবুল করিলে আর তাহাকে পথে আনার উপায় থাকেনা। পরন্তু উহা শরীয়ত মতে নাজায়েজ। পীর ছাহেব এই কার্য্যের ঘোর প্রতিবাদ করিতেন এবং হেদায়েতের নামে এইরূপ অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়ায় তিনি বড়োই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। যাহাহোক; পীর ছাহেব হেদায়েত না করিয়া কোন অবস্থাতেই দাওয়াত কারীর বাড়ীতে আহার করিতেন না এবং তাহার উপার্জ্জন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হইয়া হাদীয়া ও নজর-নেওয়াজ গ্রহণ করিতেন না।

একদা এক সঙ্গতি সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত তালুকদারের বাড়ীতে পীর ছাহেবের দাওয়াৎ হইল। পীর ছাহেব দাওয়াত কবুল করিলেন এবং যথাসময়ে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দাওয়াৎ কারী বড় লোক, ধনী। বাড়ীতে দালান কোঠা। হয়ত তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে যে সমস্ত আলেম তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া খানা পিনা ও টাকা পয়সা গ্রহণ করিয়া পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের ন্যায় পীর ছাহেবও বাড়ীতে যে সমস্ত বে-শরাহ কার্য্যাদি চালু আছে তাহার প্রতি-লক্ষ্য না করিয়া খানা পিনা খাইয়া চলিয়া যাইবেন। তাহাদের বাড়ীতে গ্রামোফোনে গান চলিত, দাসী, বাঁদী, চাকর কর্ম্মচারী, মেয়ে, পুরুষ, অন্দরে বাহিরে অবাধগতিতে যাতায়াত করিত। আয়, উপার্জ্জন, দলীল, দস্তাবেজ ইত্যাদিতেও বহু দোষ ত্রুটী

সমিতি করিয়া আসিলেন; কিন্তু তাহাদের খানা পানি গ্রহণ করিলেন না।

(৩)

বরিশালের অন্য একটি খ্যাতনামা জমিদার বাড়ীতে পীর ছাহেব বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হন। পীর ছাহেব সেখানেও এই শর্ত্তে দাওয়াত কবুল করেন যে, এক গ্লাস সরবতও সে বাড়ীতে তিনি গ্রহণ করিবেন না। দাওয়াতকারী অগত্যা তাহাতেই রাজী হইয়াছিলেন। আমরা পীর ছাহেবের সঙ্গে সেই জমিদার বাড়ীতে সভা করিলাম। পীর ছাহেব সেখানে তাঁহার বাণী শুনাইয়া আসিলেন। কিন্তু খানা পিনা কিছুই গ্রহণ করিলেন না। আমাদের বজরা প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ছিল, এদিকে আবার মুষলধারে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা বজরায় ফিরিয়া খাওয়া দাওয়ার কিছুই পাইলাম না। বর্ষার দরুণ বজরায় খানা পাকানো সম্ভব হয় নাই। পীর ছাহেব সহ আমরা সকলেই সেদিন চিড়া খাইয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। পীর ছাহেবের জীবনে এরূপ ঘটনা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ছিল।

(৪)

আর একবারের আর একটি ঘটনা এই। এক নূতন স্থানে পীর ছাহেব আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। সেখানকার নিমন্ত্রণকারীরা চাঁদা তুলিয়া পীর ছাহেব এবং তাঁহার সঙ্গীয় গনের জন্য বিরাট এক ভোজের সামগ্রী ও বিস্তর টাকা পয়সা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। দাওয়াত কারীরা উহা ডালায় ডালায় সাজাইয়া পীর ছাহেবের বজরায় তুলিয়া দিলেন এবং টাকা গুলিও পীর ছাহেবকে দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। পীর ছাহেব তখন সেগুলি রাখিয়া দিলেন। সভার কার্য্য শেষ হইল। ওয়াজ নছিহত হইল। পীর ছাহেব পরে খাদ্যাদি এবং টাকা পয়সা কিরূপে সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, সমুদয় জিনিষ চাঁদা করা হইয়াছে সকলের উপার্জ্জন হালাল কি-না জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সে বিষয় সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারিলেন না। সুতরাং পীর ছাহেব তাহাদের সমুদয় হাদীয়া, টাকা পয়সা ইত্যাদি ফেরৎ দিয়া আসিলেন।

কোন কোন স্থানে এরূপ হইয়াছে যে, দাওয়াতকারীর অবস্থা প্রথমে ভালই মনে করিয়া এবং তাহার মাল হালাল মনে করিয়া খানা পাকাইবার বা আয়োজন করিবার এজাজৎ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরে হয়ত জানা গিয়াছে যে, তাহার ঈপার্জ্জনে অথবা শরীয়তের আমলে এমন অভাব ছিল যে, তাহার খানা কবুল করা যাইতনা। সেক্ষেত্রে পীর ছাহেব সমূদয় খানার মূল্য হিসাব করিয়া দাওয়াত কারীকে টাকা দিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, "আপনার খানা খরিদ করিয়া খাইলাম। আপনি যদি অপনার আয়ের সমূহ সংশোধন করিতে পারেন, তবে আপনার নিকট হইতে আমার এই প্রদত্ত টাকা ফেরত লইব; নইলে নয়।"

মজলিছে সাক্ষ্য গ্রহণ

কোনও সময় এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে, যে পীর ছাহেব কোন নূতন স্থানে দাওয়াত গ্রহণ করিয়াছেন। দাওয়াত কারীর রুজী, রোজগার, পরহেজগারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জানা ছিল না। তিজ্ঞাবাদ করিয়াও তাহার কোন ত্রুটী ধরা যাইত না কিংবা লোকে শত্রুতা করিয়া পীর ছাহেবের নিকট তাহার শেকায়েত করিত এমতাবস্থায় দাওয়াতকারীগণকে মজলিছের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া উপস্থিত জনতার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত যে, উক্ত ব্যক্তিগণের উপার্জ্জন হালাল কি-না! বিরুদ্ধ সাক্ষ্য পাওয়া না গেলে অথবা অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে তাহাদের খানা গ্রহণ করিতেন। এরূপ ঘটনা বহুবার আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কেবল এইসব বড় বড় ব্যাপারেই নহে। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষুদ্রতম হাদীয়ার ব্যাপারেও একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। অপরিচিত কোন ব্যক্তি কিছু হাদীয়া উপস্থিত করিলে তাহার বাহ্যিক চেহারায় শরীয়তের ব্যতিক্রম দেখা গেলে হাদীয়া গ্রহণ করা হইত না। পীর ছাহেব যদি দেখিতেন যে, সে ব্যক্তি তওবা করিয়াছে এবং হেদায়েত কবুল করিয়াছে তবুও তাহার হাদিয়া তাহারই নিকট তিনি আমানত স্বরূপ রাখিয়া দিতেন এবং বলিতেন, "কিছুদিন পরে পুনঃ আমার সহিত দেখা করিবেন, পরে আমা'ক এই হাদীয়া পৌছাইবেন, কিংবা নামাজ যখন আর মোটেই কাজা হইবে না তখন এই 'আমানত' আমার নিকট পৌছাইবেন।" কখনও তাহাদিগকে তাম্বিহ্ করিয়া বলিতেন—"খবরদার! আমার এই আমানত মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিশোধ করিবেন।" বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থায় কতো হাজার হাজার লোক যে পীর ছাহেবের হাতে হেদায়েত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

পীর ছাহেব এক শ্রেনীর আলেমদের মত 'পরদা পুশি' পছন্দ করিতেন না। নামাজ, অজিফা এবং দিবারাত্রের তিন চারি ঘণ্টা মাত্র সময় বাদ দিয়া বাকী সমস্ত সময়েই লোকজন লইয়া থাকিতেন। লোকের ভীড় সব সময়ে লাগিয়াই থাকিত; এবং সকল অবস্থায় যাহাকে যে কৌশলে পারিতেন আল্লাহর রাস্তায় টানিয়া আনিতেন।

কয়েকটী কারণে পীর ছাহেব কেবলা হাদীয়া গ্রহণে উক্তরূপ কড়াকড়ি করিতেন। প্রথমতঃ হাদীছের শিক্ষা এই যে—

كلوا من الطيبات واتقوا عن الشبهات

অর্থাৎ "হালাল দ্রব্য খাও, এবং সন্দেহের জিনিষ সমূহ হইতে বাঁচ।" শরীয়তের এই আদেশ যথার্থভাবে তিনি পালন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেনীর আলেম রুজীর লোভে এবং তাক্ওয়ার অভাবে দাওয়াৎ সম্পর্কে তাহ্কীক করা দরকার মনে করিতেন না। পীর ছাহেব এই ধরণের আলেমদের আচরণ সম্পর্কে বড়ো বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। কারণ তাঁহাদের দ্বারা ফাছেক ব্যক্তিগণ প্রশ্রয় পাইত এবং তাহাদের সাহস বাড়িয়া যাইত, সুতরাং তাহাদিগকে হেদায়েত করা বিশেষ কঠিন হইয়া

দাঁড়াইত। পীর ছাহেব এই সব শিথিলতা দূর করিয়া নিজের জীবন দ্বারা প্রকৃত আলেম এবং হাদীর আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ অল্লাহ্‌ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها -

অর্থাৎ "এমন কোন প্রাণী নাই যাহার রেজেকের ভার আল্লাহ্‌র উপর ন্যাস্ত নহে।" ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, সকল জীবের রেজকের জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালাই জামেন। এই পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি পাইবার পরেও-হিলা বাহানা করিয়া এবং তাহ্‌কীক তদন্ত না করিয়া যে সমস্ত আলেমগণ দাওয়াতে যাইয়া হারাম হালাল বিচার ব্যাতিরেকে হাদীয়া ও খয়রাত গ্রহণ করেন তাহারা পাকা দুনিয়াদার। তাহারা হেদায়েত পণ্ড করিতেছেন এবং দেশকে গোমরাহীর পথে ঠেলিয়া দিতেছেন। উহার প্রতিবিধান করতঃ শরিয়তের পুর্ণ আদর্শ বহাল করাই পীর ছাহেবের উদ্দেশ্য ছিল।

চতুর্থতঃ—পরমুখাপেক্ষিতার দরুণ আলেমগণ নিস্তেজ, দুর্ব্বলচেতা এবং লোকের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইয়া পড়েন। ইহাতে তাওয়াক্কোল এবং আত্মমর্য্যাদা বোধ অনেকখানি কমিয়া যায়। তাই পীর ছাহেব নিজের আমলের দ্বারা হাদী আলেমগণের সামনে অনুকরণার্থে যথার্থ আদর্শ ও নজীর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, পীর ছাহেব কেবলার হেদায়াত কেবল মৌখিক ছিল না বরং নিজের জীবনের প্রতি কাজের ভিতর দিয়া তিনি

রছুলুল্লাহ্‌ (দঃ) এর জীবনের আদর্শ ও নিষ্ঠা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই ভাবে তিনি ইছলামের লুপ্ত প্রায় আদর্শ ও শরীয়তের বিস্মৃতি প্রায় হুকুমগুলি পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া একজন মোজাদ্দেদের কাজ করিয়া গিয়াছেন।

ছফরের পরিণামে

পীর ছাহেব যখন তাবলিগী ছফর প্রথম আরম্ভ করেন তখন সভাস্থলে অতি অল্প সংখ্যক লোক শ্রোতা হিসাবে হাজীর হইতেন। সেই অল্প সংখ্যক লোকের মধ্য হইতে দুই একজন লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় অগ্রসর হইয়া আসিত এবং মুরীদ হইত। পীর ছাহেব অতি স্নেহে তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতেন, সঙ্গে রাখিতেন এবং তাছাওয়াফ শিক্ষা দিতেন। বৎসরের পর বৎসর এইরূপ তা'লীম দিয়া যাইতেন। তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন, সংশোধন করিতেন, বুদ্ধি, পরামর্শ এবং ভরসা দিতেন। এই ভাবে দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহাদিগকে গঠন করিতেন এবং তাহাদের দ্বারা সম্ভাব্য সকল প্রকার শরীয়তের কাজ করাইতেন। কাহারও দ্বারা একটী মাদ্রাছাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত করাইতেন এবং উহা পরিচালন ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করিতেন। তিনি সভা করিয়া লোকদিগকে এলমের উৎসাহ দিতেন; চাঁদা তুলিয়া দিতেন। ছাত্রদের জন্য জায়গীর ঠিক করিয়া দিতেন। মুষ্টিভিক্ষা, বার্ষিক চাঁদা

ইত্যাদি দেওয়ার জন্য জনতার নিকট আবেদন করিতেন। এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এক একটী মাদ্রাছার পিছনে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দান করিয়াছেন ফলে মাদ্রাছাহ্‌টী ক্রমোন্নতর পথে অগ্রসর হইয়াছে।

একটী নির্জ্জন পল্লীতে এইভাবে এক বা একাধিক লোককে নিজের আদর্শে গঠন করিয়া তাহার দ্বারা এক একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। যেখানে দিবারাত্রে একবার আজান দিবার একটি লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না সেইখানে ধীরে ধীরে শত শত তালেবে এলম আসিয়াছে, ছোট বড়ো আলেম শিক্ষক আসিয়াছেন এবং বিরাট এলাকা জুড়িয়া আশে পাশের গ্রামগুলি আজানের ধ্বনীতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, কোরআনের ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস আলোড়িত হইয়াছে। বহু সভা সমিতি সেই স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে: এমনি ভাবে ইছলামের চর্চ্চা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিছুকাল পরে যখন পীর ছাহেব আবার সেই গ্রামে গিয়াছেন তখন নিজের চোখে দেখিয়াছেন তাহার মহৎ প্রচেষ্টার পরিণাম। দেখিয়াছেন শত শত তালবে এলেমের জীবন্ত আনাগোনা; দেখিয়াছেন বিরাট একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বহু আলেম ফাজেলের একত্র সমাবেশ। দেখিয়াছেন দেশময় নূতন চেতনা, নূতন জাগরণ। এরূপ শত শত স্থানে পীর ছাহেবের স্মৃতি ও কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে।

বিভিন্ন এলাকায় ছফর

পীর ছাহেব প্রথম জীবনে বেশির ভাগ বরিশাল জেলায় ছফর করিতেন। অবশ্য বিভিন্ন জেলা হইতে ও বহু দাওয়াৎ আসিত, কিন্তু তিনি এই বলিয়া উহা ফিরাইয়া দিতেন যে, তাঁহার নিজের জেলাই বেশী পিছনে। এই দেশবাসী তাঁহার 'আহ্‌ল'। সুতরাং নিজ দেশ হেদায়াত করাই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তিনি অন্যান্য জেলার বহু দাওয়াত স্থগিত রাখিবেন।

পীর ছাহেবের দাওয়াৎ গ্রহণ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি দাওয়াৎ আসা মাত্রই উহা গ্রহণ করিতেন না। তিনি দাওয়াৎ কারীর আগ্রহ পরীক্ষা করিবার জন্য উহা বহুবার প্রত্যাখ্যান করিতেন তাহার কারণ এই ছিল যে, আগ্রহ যতোই বেশী হইত হেদায়েতের কাজ ততই বেশী হইত। এই জন্য তিনি খুব সহজে কোনও দাওয়াতে যাইতে স্বীকৃত হইতেন না। তাই বলিয়া দাওয়াতকারীকে বেজারও করিতেন না। সান্তনা বাক্যে তাহাদিগকে বিরত রাখিতেন। যখন দাওয়াত কারীগণের পক্ষ হইতে সুপারিশ ও অনুরোধ এরূপ হইত যে, উহা কবুল না করিয়া উপায় থাকিত না, তখনই তিনি স্বীকার করিতেন। পীর ছাহেবের জনৈক খলিফা ছাহেব একাদিক্রমে তিন বৎসর চেষ্টার পর নোয়াখালি জেলায় পীর ছাহেবকে প্রথম বারের মত দাওয়াৎ কবুল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নোয়াখালি জেলার হায়দরগঞ্জ

গ্রামে জনাব মাওলানা আজিজুর রহমান ছাহেবের বাড়ীতে প্রথম দাওয়াৎ গ্রহণ করেন। আলেম প্রধান নোয়াখালি জেলায় পূর্ব্বেই পীর ছাহেবের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেখানকার বহু আলেম এবং সাধারণ লোক পীর ছাহেবের নিকট পূর্ব্বেই বাইয়াৎ হইয়া ছিলেন। পীর ছাহেবের সাক্ষাৎ প্রতীক্ষায় লোক আগ্রহে ব্যাকুল ছিলেন। জিলার বহু দুর দুরান্তরের লোকও উক্ত স্থানে সমবেত হইয়াছিল। পীর ছাহেবের সহিত মোলাকাতের জন্য জেলার বহু আলেম ওলীমার সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত স্থানে তিনি আলেম এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিপুল সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। পরে নোয়াখালি জেলার ভবানীগঞ্জ, টুমচর, রসীকপুর, রায়পুরা, লক্ষ্মীপুরা, মাদারী, ফেনী, জয়াগ ও হাতিয়া প্রভৃতি স্থান সমূহে এক ও একাধিকবার ছফর করেন। এই সকল স্থানে বহু লোক আলেম, ফাজেল নির্ব্বিশেষে পীর ছাহেব কেবলার নিকট বাইয়াৎ গ্রহণ করেন এবং নানা বিষয়ে নছিহত শ্রবন করিয়া বরকত হাছিল করেন। এই জেলার বহু সংখ্যক আলেম পীর ছাহেবের নিকট মুরীদ হন এবং দীর্ঘ দিন সংসর্গে থাকিয়া তরিকা সমাপ্ত করেন। পরিণামে তাহারা তাঁ'লীম ও তাওয়াজ্জোহ, দান করিবার এজাজত লাভ করিয়া হেদায়েতের কার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

ফরিদপুর ছফর

ফরিদপুর পীর ছাহেব কেবলার নিজ জেলার পার্শ্ববর্ত্তী জেলা হওয়ার দরুণ এই জেলায় তিনি বহু পূর্ব্ব হইতে দাওয়াৎ গ্রহণ করতঃ বহুস্থানে ছফর করেন। চর মুগু রিয়া, মাদারীপুর, রাজৈর পালং, ডামুডিয়া প্রভৃতি এলাকায় পীর ছাহেব একাধিকবার ছফর করেন এবং সভা সমিতি করেন। এই সকল এলাকায় পীর ছাহেবের নিকট বহুলোক বাইয়াৎ গ্রহণ করেন এবং তরীকা পন্থা হিসাবে দীনদারীতে বহু মজবুত হন। পীর ছাহেবের পিছনে ঈদের নামাজ পড়িবার জন্য কয়েক বছর নিয়মিত ভাবে চর মুগুরিয়াবাসীরা তাঁহাকে দাওয়াৎ করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে অবসর অভাবে তিনি নিয়মিত ভাবে সেখানে যাইতে পারেন নাই। মাদারীপুর মহকুমায় পীর ছাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী ইছলামীয়া মাদ্রাছাহ রহিয়াছে। উহার মধ্যে কয়েকটি উচ্চ মানে উন্নীত হইয়াছে এবং বিশেষ সুনামের সহিত চলিয়া আসিতেছে। এই জেলায় পীর ছাহেবের কতিপয় প্রভাবশালী খলিফা হেদায়েত কার্য্যে রত রহিয়াছেন। এই সকল স্থানে প্রায় প্রতি বৎসরই বিরাট বিরাট সভার আয়োজন করিয়া মহাসমারোহে পীর ছাহেবকে লইয়া যাইতেন। সভায় বিপুল সংখ্যক লোক পীর ছাহেবের হাতে বাইয়াৎ গ্রহণ করিয়া পূর্ণ ইছলামী জিন্দেগী যাপন করিতে বদ্ধ পরিকর হইতেন।

কুমিল্লা ছফরে

পীর ছাহেবের শোহ্‌রত ব্যাপক হওয়ার পরে কুমিল্লা জেলার বহু আলেম ও খোদাম্বেষী ব্যক্তি পীর ছাহেবের বাড়ীতে আসিয়া বাইয়াৎ হন। অতঃপর তাহারাও পীর ছাহেবকে নিজ জেলায় লইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে থাকেন। তাহাদের, ঐকান্তিক আগ্রহে বাধ্য হইয়া পীর ছাহেব কুমিল্লার ছফরে যাইতে শুরু করেন। এ জেলার প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই পীর ছাহেব ব্যাপক ভাবে ছফর করেন। চাঁদপুর, হাজাগঞ্জ, লাকসাম, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা, গাজীমুড়া দাউদকান্দি, ধামতি, নায়ের গাও, মতলব, রূপসা, কালীর বাজার, গাজীপুর, সাদরা প্রভৃতি স্থানে তিনি দাওয়াত কবুল করেন। বলা বাহুল্য, এই জেলায় গাজীপুর, সৈয়দপুর, নায়ের গাও ও লাঙ্গল কোট, মেকদাইর, রামপুর, সিঙ্গুলা, শহীদ নগর ও ঢালুয়া প্রভৃতি স্থানের মহফিলগুলিতে এতাদৃশ লোক সমাগম হইতে যে উহা নিয়ন্ত্রণ করা এবং কণ্ঠস্বরে তাহাদিগকে ওয়াজ শুনানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। জেলার বহু দূর দূরান্তর হইতে দলে দলে লোক সভায় যোগদান করিতেন। এই জেলার জনসাধারণ পীর ছাহেব কেবলার প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

একবার একটী মাহফিলে যোগদান করিবার জন্য পীর ছাহেব বৃহৎ বজরায় চলিয়াছেন। সভাস্থলের ২৷১ মাইল রাস্তা বাকী

থাকিতে একটি হাজামজা খাল অতিক্রম করিতে হয়। অবস্থা গতিকে সম্পূর্ণ খালটী কচুরিপানায় এমন ভাবে আটকাইয়া গিয়াছিল যে, সেই খালে নৌকা চলাচলের কোনই উপায় ছিল না। কাজেই পীর ছাহেবের বজরা পথে আটকাইয়া গেল। দাওয়াতকারীগণ এই অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং গ্রামের দিকে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম যে শত শত লোক গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা আসিয়া বজরার দুই দিকে কাছি বাঁধিয়া সেই বিরাট বজরা শুষ্কপ্রায় খালের মধ্যদিয়া বিরাট উল্লাস ও ধ্বনী সহকারে টানিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিলেন। এইরূপ কোন কোন দাওয়াতে ৫।৬ মাইল দীর্ঘ স্থল পথে পীর ছাহেবের পালকী শত শত গ্রামবাসী পরম উল্লাসে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

এইরূপ মেঘনা নদী হইতে প্রায় তিন মাইল অভ্যন্তরে পীর ছাহেব একটি দাওয়াতে গমন করেন। নদীর ঘাটে পীর ছাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কয়েক সহস্র লোক আসিয়াছিলেন। নিশান, মিছিল ও ধ্বনী সহকারে তাঁহারা এক রাজকীয় সম্বর্দ্ধনার সহিত পীর ছাহেব কেবলাকে সেই দীর্ঘ তিন মাইল পথ লইয়া গিয়াছিলেন। সেবার আমরাও অনেকে পালকীতে চড়িয়া মাহফিলে গিয়াছিলাম। শত শত লোক পীর ছাহেবের পালকী ধরিবার স্থান পাইতেছিলেন না। বায়ুবেগে সেই পালকী উড়িয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য পালকী গুলি পৌছাইল অনেক পরে। সভাস্থলে শুধু

লোক আর লোক, যেন জন-সমুদ্র। জনতা পীর ছাহেবের সান্নিধ্য লাভের জন্য মঞ্চের দিকে এরূপ চাপ দিল যে, উহা আর নিয়ন্ত্রণ করাই সম্ভব হইল না। অতঃপর মাগরিবের নামাজের পর জনতা কিছু স্থির ও প্রসমিত হইলে ভিন্ন প্যাণ্ডালে সভার আয়োজন হইয়াছিল। সেখানে ওয়াজ নছিহৎ অপেক্ষা তালীম তাওয়াজ্জোহ অধিক হইয়াছিল। বহু সংখ্যক লোক সেই বৈঠকে বাইয়াৎ গ্রহণ করেন। পীর ছাহেব সেখানে একদিন অবস্থান করেন। দাওয়াতকারী বহু অর্থ ব্যয়ে এই জলছার আয়োজন করিয়াছিলেন। একদিন পরে পীর ছাহেব সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের আরজু উহাতে নিবৃত হইল না। বিদায় কালে তাঁহারা দলে দলে পালকীর সহিত দৌড়াইতে ছিলেন। অনেকে হাদীয়া হাতে দিবার সুযোগ না পাইয়া পালকীতে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিতে ছিলেন। মরহুম মাওলানা হাবিবুর রহমান ছাহেব এই মহফিলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি শর্ষিনা মাদ্রাছার সুদক্ষ মুদার্রেছ এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। পীর ছাহেব কেবলার তিনি একজন অন্যতম ভক্ত মুরীদ খলিফা এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া দরবারের একজন বিশিষ্ট রোকন ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁহার রুহকে মাগফেরাৎ দান করুন। পীর ছাহেব এখানে একটি মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনি কয়েকবার এই স্থানে তশরীফ আনিয়াছিলেন। তাহাদের এতেকাদ এবং খেদমতে পীর

ছাহেব কেবলা বিশেষ প্রীত হন এবং অকুণ্ঠিত ভাবে দোওয়া করেন।

এই প্রকার আর একটি জনবহুল জলছার অনুষ্ঠান হইয়াছিল কুমিল্লা টাউনের নিকটবর্ত্তী সৈয়দপুরে। বেশুমার লোক সমাগমে একটি বিরাট ময়দান পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জেলার বহুদূর দূরান্তর হইতে বহুলোক জমায়েত হইয়াছিল। সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষিত ও সাধারণ জনতা বিপুল আগ্রহে পীর ছাহেবকে দর্শন করিতে এবং তাঁহার নছিহত শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন। কুমিল্লার আরও অনেক সভায় এইরূপ ব্যাপক ভাবে জনতা পীর ছাহেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। বরিশাল জেলার পরই কুমিল্লা জেলায় পীর পীর ছাহেবের মুরিদের সংখ্যা অধিক হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ঐ জেলায় পীর ছাহেবের খলিফা সংখ্যাও অনেক। তাহাদের মধ্যে কতিপয় খলিফা বিশেষ প্রভাবশালী এবং তাহাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে তাবলীগ, হেদায়েত ও তালীমের কাজ দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে।

আগরতলা ছফরে

ত্রিপুরা ষ্টেটের আগরতলা অঞ্চলে পীর ছাহেবের বহু মুরিদ রহিয়াছে। পীর ছাহেব কেবলার সুখ্যাতি শুনিয়া আগরতলার কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি শর্ষিনায় আগমন

করেন এবং বহু আয়াস স্বীকারে পীর ছাহেবকে আগরতলা লইয়া যাইতে সক্ষম হন। যদিও সেখানে হিন্দুদের প্রভাবে মুছলমানগণ অত্যন্ত কোনঠাসা অবস্থায় জীবন যাপন করেন তথাপি পীর ছাহেব কেবলার ফায়েজ এবং ছেলছেলা সেখানে জারী রহিয়াছে। ত'লীম তালকীন ও হেদায়েতের ধারা সেখানেও খোদার ফজলে প্রবাহিত হইতেছে।

ঢাকা ছফরে

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে সমসপুর, হলদিয়া, গাওদিয়া, সাতবাড়িয়া, নরসিংদি ও শিবপুর প্রভৃতি স্থানে পীর ছাহেব আমন্ত্রণ পাইয়া তথায় গমন করেন। এই সকল স্থানে বিরাট মহফিল হয় এবং বহু সংখক লোক তরিকাভুক্ত হইয়া দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা শহরে কয়েকবার পীর ছাহেব কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে থাকা কালীন প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক নূতন নূতন লোক পীর ছাহেবের হাতে বাইয়াৎ গ্রহণ করেন।

পীর ছাহেব কেবলা রোগ চিকিৎসা উপলক্ষেও কিছুদিন ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে নলগোলা ঘাটে নিজ বজরায় অবস্থান করেন। সেই সময় প্রতিদিন বিভিন্ন জেলার বহু লোক পীর ছাহেবের সাক্ষাৎ করিয়া দোওয়া গ্রহণ করেন এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিক পীর ছাহেব কেবলার সহিত

সাক্ষাৎ করেন। তিনি যতদিন সেখানে অবস্থান করিয়া ছিলেন অগনিত সাক্ষাৎ প্রার্থীর ভীড়ে সর্ব্বদাই স্থানটি সরগরম থাকিত।

চট্টগ্রাম জেলায়ও পীর ছাহেব কেবলার মুরীদ সংখ্যা নগণ্য নহে। সেখান হইতেও বহু দাওয়াৎ আসিত। কিন্তু সময়াভাবে সেখানে ব্যাপক ছফর করিতে পারেন নাই। মাত্র কয়েকটি স্থানে যাইবার সুযোগ হইয়াছিল।

উক্ত স্থান গুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেক জেলার লোক পীর ছাহেব কেবলার নিকট আসিয়া বাইয়াৎ গ্রহণ করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলায় পীর ছাহেব কেবলার মোতাকেদ সংখ্যা প্রচুর ছিল। সেই জিলার বহুলোক শর্ষিনা আসিয়া পীর ছাহেব কেবলার নিকট মুরীদ হইয়া দীর্ঘদিন সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেকে খেলাফতও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। উক্ত জেলার জনসাধারণ পীর ছাহেব কেবলাকে দেশে লইবার জন্য বহুদিন ধরিয়া বিপুল আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সময়াভাবে পীর ছাহেব সেখানে যাইতে পারেন নাই। পীর ছাহেব কেবলাকে প্রতি বৎসর পূর্ব্বোল্লিখিত জেলা সমূহে এত ব্যাপক অঞ্চলের দাওয়াৎ সমাপ্ত করিতে হইত যে, জীবনের শেষ ভাগে নদীপথে লঞ্চে ছফর করিয়া এবং প্রতিদিন একটি কখনও সম্ভব হইলে দুইটি মাহফিল করিয়াও প্রতি বছরেই বহু দাওয়াতকারীকে বঞ্চিত করিতে হইত হইত। এইজন্য তিনি 'ময়মনসিংহ জেলায়

ছফরের এরাদা খোদার হাতেই ছোপর্দ্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ময়মনসিংহ ছফরের সুযোগ আসার পূর্ব্বেই তাঁহার হায়াতের নির্দ্দিষ্ট দিনগুলির পরিসমাপ্ত ঘটিয়াছিল।

বগুড়া জেলায় পীর ছাহেব জীবনের শেষভাগে ২।১ বার ছফর করিয়াছিলেন। উল্লিখিত জেলাগুলিতেও পীর ছাহেবের মুরিদ সংখ্যা নগণ্য নহে। তা'লীম তাওয়াজ্জোহ দিবার দিবার উপযুক্ত কয়েকজন খলিফাও সেদিকে রহিয়াছে।

খুলনা ছফরে

খুলনা জেলার কয়েকটি অঞ্চলে পীর ছাহেব ছফর করিয়াছিলেন। মোরেলগঞ্জ, রায়েন্দা, বাগের হাট, এবং আমতলী থানার বহুস্থানে তিনি ছফর করেন। এতদ্ব্যতীত খুলনা সদরেও কয়েকবার দাওয়াৎ কবুল করিয়াছিলেন। সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহু সমারোহ সহকারে পীর ছাহেবকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার দর্শন লাভে আপ্যায়িত হন। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে পীর ছাহেব কেবলার অজস্র মুরীদ রহিয়াছে।

বিভিন্ন দেশে পীর ছাহেবের মুরীদ

পীর ছাহেব কেবলা বাংলার বাহিরে কোথাও তবলীগে যান নাই। আসাম ও বার্ম্মা হইতে কয়েকবার আমন্ত্রণ আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই সমস্ত স্থানে যাইবার সুযোগ

করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যাইতে না পারিলেও তাঁহার খ্যাতি বাংলার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং আসাম, বর্ম্মা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতেও লোকজন আসিয়া বাইয়াৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘ দিন তাঁহার ছোহবতে ছিলেন।

মালাবারে মুরীদ ঃ—

মালাবার দ্বীপের একজন বিশিষ্ট লোক আসিয়া পীর ছাহেবের দরবারে বহুদিন অবস্থান করেন। তিনি পীর ছাহেবের হাতে বাইয়াৎ হন এবং বহু উচ্চ দরজা লাভ করেন। তাহার ভাষা আরবী ছিল এবং তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন।

লাদাখে (কাশ্মীর) পীর ছাহেবের খলিফা

একবার লাদাখ হইতে একজন আলেম পীর ছাহেবের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি দীর্ঘদিন হুজুরের সঙ্গে অবস্থান করেন এবং তরিকা শিক্ষা করতঃ ছনদ অর্জ্জন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বর্ম্মা সীমান্তে পীর ছাহেবের মুরীদ

বর্ম্মা সীমান্ত হইতেও একব্যক্তি পীর ছাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল দরবারে থাকিয়া

তরিকা মশক্ করেন। তিনি কঠিন রিয়াজত করিতেন এবং প্রায় সময়েই এবাদত ও জেকরে নিমগ্ন থাকিতেন।

আসাম প্রদেশে পীর ছাহেবের বহু সংখ্যক মুরীদ রহিয়াছে তাঁহারা পীর ছাহেবের দরবারে আসিয়া তালীম তাওয়াজ্জোহ্ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ছোহবত গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপে পীর ছাহেবের তালীম ও ফায়েজ বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশে পৌঁছিয়াছে।

তা'লীম ও তাওয়াজ্জোহ

পীর নিজ কলব হইতে মুরীদের কলবে যে প্রভাব নিক্ষেপ করেন উহাই তাওয়াজ্জোহ্। এই শিক্ষার আদান প্রদানই পীর মুরীদীর প্রধান কাজ। তাওয়াজ্জোহর আদান প্রদান দ্বারাই পীর মুরীদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুরীদের কলবে তাওয়াজ্জোহ দানের ক্ষমতা দ্বারাই পীরের আধ্যাত্মিক শক্তি নিরূপিত হইয়া থাকে। যিনি যতোখানি কামেল পীর হইবেন এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব বিচ্ছুরণের ক্ষমতা যতো বেশী হইবে তিনি তত সহজে মুরীদের কলবে প্রভাব পৌছাইতে সমর্থ হইবেন। তিনি একই বৈঠকে সহস্র সহস্র মুরীদের কলবে নিজ কলবের প্রভাব সমান ক্ষমতার সহিত পৌছাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন। ইহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এলম, একটি পৃথক সাধনা। এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ;

কিন্তু এখানে উহার অবকাশ না থাকায় অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

পীর ছাহেব আগ্রহশীল লোকদিগকে বাইয়াৎ করিতেন তৎপর তাওয়াজ্জোহ দান করিতেন। তাঁহার জীবনের অজস্র কাজের ভিতর ইহা একটি প্রধান কাজ ছিল। তিনি সর্ব্বাবস্থাতেই তাওয়াজ্জোহ দানের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। কথাটা এরূপভাবে বলা ঠিক হইলনা। অর্থাৎ তিনি স্বাভাবিক ভাবে সর্ব্বাবস্থায় তাওয়াজ্জোহ দানের অবস্থায় উন্নীত ছিলেন। একটি জ্বলন্ত প্রদীপ হইতে যেমন উহার দাহিকা শক্তি কখনও পৃথক হয় না; সেইরূপ তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রজ্জলিত থাকিতেন। যতক্ষণ, সজাগ থাকিতেন ওজুর সহিত কাটাইতেন; তছবিহ হাতেই থাকিত। কখনও বা তিনি নফি এছবাত করিতে থাকিতেন। বিশেষ কোনও কাজ না থাকিলে মোরাকাবায় বসিয়া যাইতেন। যে কোনও লোক আসা মাত্রই তাহার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। বাইয়াৎ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কখনও সঙ্গে সঙ্গেই বাইয়াৎ করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাওয়াজ্জোহ দানের জন্য বসাইয়া দিতেন। কখনও জোহর অথবা মাগরিবের নামাজের পর মছজিদে বসিয়া ছবক গ্রহণের নির্দ্দেশ দিতেন। আবার দরবারস্থ খলিফাগণের কাহারও হাওলা করিয়া দিয়া দুরুদ শরীফ কিংবা প্রাথমিক ছবক দান করিতে হুকুম দিতেন। আগন্তুক কি ধরণের লোক,

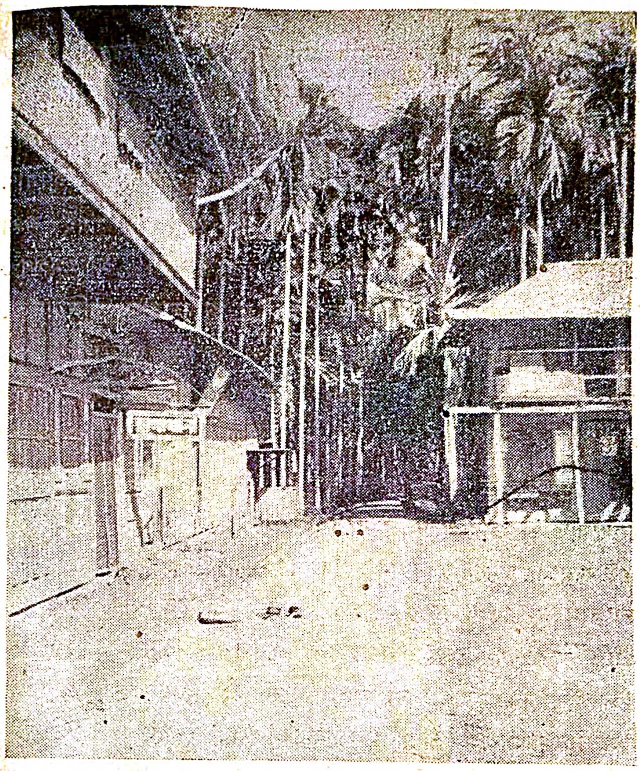
তাহার পেশা কি, অবসর কি পরিমাণ থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতেন। সংসার ভুক্ত সাধারণ শ্রেণীর লোক হইলে তাহাদিগকে প্রায়ই চিশতিয়া তরিকায় ভর্ত্তি করিতেন। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত আলেম হইলে তাহাকে অবস্থাভেদে নকশাবন্দিয়া-এ মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় তাওয়াজ্জোহ দান করিতেন। দূরাগত চাকুরিয়া কিংবা সংসারভুক্ত লোক হইলে তাহাকে যথা সম্ভব দ্রুততার সহিত অনেক দূর অগ্রসর করাইয়া দিতেন। অর্থাৎ তাহাকে ফোরছত মাত্র না দিয়া অনবরত ছবক মশক করিবার জন্য তাকিদ দিতেন। পীর ছাহেব কেবলা শত শত কাজও কথা বার্ত্তার ভিতরে, বহু জনতা এবং কোলাহলের ভিতরেও তাহাদিগকে এক পার্শ্বে বসাইয়া দিতেন এবং তাওয়াজ্জোহ দান করিতে থাকিতেন। একই সময় বহুদিকে মনোযোগ দান যেমন, কেতাব হইতে মছলা সমূহ আলোচনা, ফতোয়া সংকলন, নবাগত গণকে অভ্যর্থনা ও আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসাবাদ করা, কাহাকেও ঝাড় ফুকদান, কাহারও ব্যক্তিগত কথা নিরিবিলিতে শ্রবণ, কাহারও জন্যে দোওয়া করা ইত্যাদি প্রকারের কাজে রত থাকিয়াও তিনি সমান ভাবে তাওয়াজ্জোহ দান করিয়া যাইতেন। ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ আমরা নিত্যকার জীবনে অহরহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইরূপ শত শত কাজের মধ্যেও তরিকাভুক্ত ব্যক্তিগণকে তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ কালে বেহাল এবং বেহুশ

হইতে দেখিয়াছি। এরূপ অবস্থায় কখনও কাহারও মনে এরূপ ধারণা হইত যে, পীর ছাহেব হয়ত অন্যমনস্ক রহিয়াছেন সুতরাং তাহারা অনর্থক চেষ্টা করিতেছেন। সেরূপ অবস্থাও পীর ছাহেবের দৃষ্টি এড়াইত না এবং তিনি তখনই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন এবং পীর ছাহেব যে তাহাদের সম্পর্কে অমনোযোগী ছিলেন না তাহা জানাইয়া দিতেন। একই হালকায় একই বৈঠকে নূতন, পুরাতন, উচ্চ, নীচ, আলেম, সাধারণ, চিশতিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া পন্থী সকল মুরীদই বসিয়া যাইতেন এবং একই অবস্থায় সকলকেই তাওয়াজ্জোহ বিতরণ করিতেন। বলিয়া দিতেন, "যাহার যে ছবক থাকে নিয়ত করিয়া বসুন। বিভিন্ন তরিকায় বিভিন্ন ছবকের শত শত মুরীদ বসিয়া যাইতেন এবং সকলেই যার যার প্রয়োজন মত 'ফায়েজ' লাভ করিতেন, কেহই বঞ্চিত হইতেন না।

পীর ছাহেব কেবলার কোন নির্দ্দিষ্ট হাল্‌কা এ জেকর ছিল না। হালকায়ে জেকের সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে ঘিরিয়া থাকিত। ফজরের নামাজ বাদ নিজ অজিফা মোরাকাবায় নিমগ্ন থাকিতেন। বিশেষ জরুরী কাজ না থাকিলে প্রায়ই ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত মোরাকাবায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাওয়াজ্জোহ প্রার্থীরা পিছনে বসিয়া থাকিতেন। এই সময় প্রায়ই তা'লীম দান করিতেন না। তবে ছফরে কিংবা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাওয়াজ্জোহ দান করিতেন। জোহরের পরেও ঐরূপ অল্প সময় তালীম দান করিতেন। তালীম দানের নির্দ্দিষ্ট সময়

ছিল মাগরিবের পর হইতে এশার নামাজের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই সময় তিনি নিজ অজিফা হইতে ফরাগত হইয়া পাশ্চাদোপবিষ্ট ছবক প্রার্থীগণের দিকে ফিরিয়া বসিতেন। নবাগত লোক থাকিলে তাহাদিগকে তওবা করাইতেন। কখনও কখনও মুরীদগণের নিকট মারেফত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করিতেন এবং তরিকায়ে তাছাওয়াফের ব্যাখ্যা করিতেন। কখনও নূতন শিক্ষার্থীগণকে প্রাথমিক তুরূদ ও নিয়ত ইত্যাদি শিক্ষা দানের জন্য উপস্থিত খলিফাদের কাহাকেও নির্দ্দেশ দিতেন। তাহার পর উপস্থিত সকলকে একত্রে বসাইয়া তাওয়াজ্জোহ দান করিতেন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বক্ষণে কাহার কি ছবক তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। কাহার কিরূপ মা'লুম হইত তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন এবং অবস্থা অবগত হইতেন। হালকায় নিয়মিত লোকদের কাহাকেও অনুপস্থিত দেখিলে তাহার খোঁজ লইতেন। গাফলতি বশতঃ কেহ অনুপস্থিত থাকিলে তাহাকে লোকদ্বারা ডাকাইয়া আনিতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দিতেন। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। বিশেষতঃ আমরা—যাহারা আলস্য বশতঃ মাঝে মাঝে হালকায় অনুপস্থিত থাকিতাম তাহাদের জন্য পীর ছাহেব উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। প্রতিটি মুরীদ সম্পর্কে তাঁহার এইরূপ আগ্রহ, উৎকণ্ঠা এবং মমতা উভয়ই দেখা যাইত।

আলেম মুরীদ সম্পর্কে পীর ছাহেবের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। তাঁহার অর্থ এই নয়যে তিনি একজন আলেমকে মুরীদ করিতে



মরহুম পীর ছাহের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দারুচ্ছুন্নাৎ প্রাঙ্গন হইতে শষিনা নদী তীর পর্য্যন্ত শ্যামল গুহাক-তরু শ্রেণী-শোভিত পাকা রাস্তার দৃশ্য।

পারিলে নিজেকে খুব কৃতার্থ মনে করিতেন। বরং তিনি একটি লোককে মুরীদ করার দায়ীত্ব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সজাগ ছিলেন। তিনি প্রায়ই এই কথাটি বলিতেন, "আমি মুরীদের জন্য ভুখা নহি। একটি লোককে মুরীদ করা আর একটি পাহাড় মাথায় লওয়া সমান। কিন্তু কি-করি, আমার পীর কেবলার হুকুম তামিল করিয়া যাইতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে সময়ে অশ্রুসিক্ত হইতেন। আলেমগণও উপযুক্ত মোরশেদের ছোহবতের অভাবে আমলহীন, দুনিয়াদার, সম্মান ও রুজীর ভুখা এবং পার্থিব ফাঁদে জড়াইয়া নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলিয়া যাইতেছেন এই দেখিয়া তিনি বড়োই বিচলিত হইতেন। এই জন্য তিনি আলেমগণকে বড় স্নেহে বড় যত্নে শিক্ষাদান করিতেন। তাহাদের দ্বারা হেদায়াত বিস্তার লাভ করিবে ইহাই তিনি আশা করিতেন। এই জন্য তিনি আলেম মুরীদগণকে দীর্ঘদিন সঙ্গে রাখিতেন তা'লীম দিতেন, তাওয়াজ্জোহ দান করিতেন এবং তাহাদের প্রতি বিশেষ নেক নজর রাখিতেন। কেবল কেতাবী এলমই হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নহে বরং আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জ্জনের সঙ্গে উহা প্রয়োগ করার কৌশল, ধৈর্য্য, তাওয়াক্কোল, ছবর ইত্যাদি নানাবিধ গুণের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই পীর ছাহেব আলেমদিগকে নিজ সঙ্গে রাখিতেন। এই ভাবে তিনি বহু আলেমের চরিত্র গঠন করিয়াছেন এবং তরিকার উচ্চ স্তরে পৌছাইয়া হেদায়াতের

কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আলেম এবং গায়ের-আলেম নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান দায়িত্ববোধ লইয়া তিনি জীবনব্যাপী নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। ইহাতে অবহেলা বা আলস্য দেখি নাই এবং এমন কাহারও মুখে শুনি নাই যে তিনি পীর ছাহেবের তাওয়াজ্জোহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বরং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত অধিক সংখ্যক লোককে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সমষ্টিগতভাবে এক হইতে একাধিক তরিকার বহু সংখ্যক ছবক উত্তীর্ণ করাইয়া দেওয়া কি ভাবে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমরা যতোই আশ্চর্য্য হইনা কেন, দুনিয়ার বিখ্যাত আওলিয়াগণের জীবনে এইরূপ ঘটনাই স্বাভাবিক। তাহাদের জীবনে ইহা একটি সাধারণ কারামত। সুতরাং পীর ছাহেবের জীবনের এই খেদমতের বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা বিচলিত হইলেও ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

পত্রযোগে তাওয়াজ্জোহ দান

পীর ছাহেব কেবলা বহু লোককে পত্রযোগেও তাওয়াজ্জোহ দান করিতেন। বহু দূরে অবস্থিত ব্যক্তি পত্রযোগে নিজ অবস্থা লিখিয়া জানাইতেন। পীর ছাহেব কেবলা তাহাদিগকে পত্রযোগে মুরীদ করিতেন, ছবক ও নিয়ত লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। তাহারা আপনাপন স্থানে বসিয়াই 'ফায়েজ' অনুভব

করিতেন। তিনি স্ত্রীলোক দিগকেও মুরীদ করিতেন এবং তাওয়াজ্জোহ দান করিতেন; কিন্তু কোনও বেগানা স্ত্রীলোক পীর ছাহেবের সম্মুখে আসিবার বা দেখা দিবার অনুমতি পাইত না। বরং পীর গায়র মোহাররম হইলে শরীয়ত অনুযায়ী যেরূপ পর্দ্দা রক্ষা করিয়া চলিবার হুকুম আছে উহা তিনি পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া অদৃশ্য ও আড়ালে থাকিয়া স্ত্রীলোকদিগকে তাওয়াজ্জোহ দিতেন। প্রায় ক্ষেত্রেই স্বামীর মারফত স্ত্রীলোকদিগকে তালীম ও তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ দিতেন। এই ভাবে বহু স্ত্রীলোক পীর ছাহেবের মুরীদ হইয়া বাতেনী এলম শিক্ষা করিয়াছেন। কচি বালক এবং পাঠাবস্থার ছাত্রদিগকে প্রায়ই তিনি তাওয়াজ্জোহ দিতেন না। তাহাদিগকে কিছু কিছু দুরূদ শরীফ পাঠ করিতে অভ্যাস করাইতেন। অবশ্য কদাচিৎ অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলে বয়স্ক ছাত্রদের কাহাকে কাহাকে মৃদুভাবে 'ফায়েজ' দান করিতেন।

তাওয়াজ্জোহের প্রতিক্রিয়া

আমরা শুনিয়াছি, প্রথম অবস্থায় পীর ছাহেব কেবলা যখন তাওয়াজ্জোহ দান করিতেন, তখন উহা মুরীদের পক্ষে ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হইয়া পড়িত; অর্থাৎ উহা অত্যধিক তেজোময় হইত। মুরীদগণ উহার বেগ সামলাইতে না পারিয়া ভীষণ

চীৎকার করিতেন, বেহুশ হইয়া পড়িতেন এবং দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিতেন না। একদিন তদীয় মোরশেদ, ফুরফুরার মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সম্মুখে নাকি এই অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল; তাই তিনি মৃদু তাওয়াজ্জোহ দানের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। অবশ্য আমরা যখন হইতে হুজুরের খেদমতে আসিয়াছি; তখন হইতে তাওয়াজ্জোহের যে সকল মজলিছ চলিয়া আসিতেছে উহাতে তাওজ্জোহের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাইয়াছি। উহা লোক বিশেষের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাওয়াজোহের ফলে কাহাকে কাহাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়াছি। এ সম্পর্কে একটি বাস্তব ঘটনা বলিতেছি :—

আমি তখন মাদ্রাছায় পড়ি। বোর্ডিংয়ে আমার সিটের পাশেই আমার এক শ্রেণী উপরের একটি ছাত্র থাকিতেন। তাহার বয়স অন্যান্য সহপাঠির তুলনায় একটু বেশী ছিল। তাহার ছুফিয়ানা ভাব আমাদের চেয়ে একটু বেশী ছিল। তিনি হামেশা মাথায় পাগড়ী পরিয়া থাকিতেন, অপেক্ষৃত লম্বা জামা এবং চাপাটুপী পরিধান করিতেন। কিছুদিন যাবৎ তাহার অবস্থায় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলাম। পড়াশুনায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া বসিয়া বসিয়া অজিফা পড়িতেন এবং মোরাকাবা করিতেন। বেশী সময় ছিটে থাকিতেন না। মছজিদে কি পীর ছাহেবের নিকট কোথাও কাটাইতেন। গভীর রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতেন এবং হামেশা নফল

নামজ পড়িতেন। পরে ক্রমান্বয়ে আরও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পাইতেছে। ভাত খাইবার সময়েও খাবার দিকে তাহার মনোযোগ থাকিত না। প্রায়ই গুণ্ গুণ্ স্বরে জেকের করিতে শুনিতাম। হঠাৎ একদিন শেষ রাত্রে চীৎকার শুনিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া শুনিলাম—আমার সেই সঙ্গী, আবদুল মো'মেন মছজিদের ছাদ হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িয়াছে এবং ভীষণ ছুটাছুটী, চীৎকার করিয়া যা খুশী তাই বলিতেছে।

ফজরের নামাজ বাদ আমরা অনেকে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে মনে করিয়া মাথায় খুব পানি ঢালিলাম। ইহাতে তাহার চেতনা কিছুটা ফিরিয়া আসিল। এই অবস্থায় মাদ্রাছায় রাখা অসুবিধাজনক মনে করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাহাকে বাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। পথিমধ্য হইতে ছুটিয়া যাইয়া নদীতে তিনি ঝাপাইয়া পড়েন এবং স্রোতে ভাসিয়া সুন্দরবনে যাইয়া ওঠেন। সেখানে হইতে তাহাকে খোঁজ করিয়া দুই একবার বাড়ীতে আনা হইয়াছিল; কিন্তু রাখা যায় নাই। আবার ছুটিয়া সুন্দরবনে চলিয়া যাইতেন। তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে, "লোকালয়ে আমার থাকা সম্ভব নয় কারণ লোকেরা খোদার নাফরমানী করে তাহা আমি সহ্য করিতে পরিনা।" পীর ছাহেব কেবলাকে আবদুল মো'মেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের

পর শুধু এইটুকু মন্তব্য করেন যে, "আবদুল মোমেন অনেক উঁচু দরজায় পৌঁছিয়াছেন।" আবদুল মোমেন পীর ছাহেবের তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ আবদুল গণি নামক এক ব্যক্তি তাওয়াজ্জোহের ফলে দীর্ঘ দিন মজ্‌জুব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তি কোন এক গ্রামের অধিবাসী আবুল বশর নামক জনৈক তরুণ যুবক তাওয়াজ্জোহের ফলে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তাহাকে রীতিমতো উন্মাদ বলিয়া মনে হইত। পীর ছাহেবের ভিতর বিলীন হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার ভিতরে প্রবল ভাবে দেখা যাইত। এইজন্য আবুল বশরকে পীর ছাহেবের নিকট হইতে দূরে এবং সাবধানে রাখা যাইত। একবার এই আবুল বশর সুযোগ পাইয়া ছুটিয়া যাইয়া পীর ছাহেবকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার পায়ের আঙ্গুলে ভীষণভাবে দংশন করিয়াছিলেন।

হাফেজ নজীর আহমদ নামক জনৈক হাফেজ ছাহেব তাওয়াজ্জোহের ফলে বাহ্যিক জ্ঞান হারাইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি অনেকদিন পরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা আরও বহু রহিয়াছে। অবশ্য মোরশেদে কামেলগণের হালকায় এরূপ ঘটনা কিছু অস্বাভাবিক বা নূতন নহে।

স্বাভাবিক অবস্থায়ও তাওয়াজ্জোহ দানের ফলে হাল্‌কা বিচলিত হইয়া উচিত। সমগ্র হাল্‌কা জুড়িয়া একটা রোল উত্থিত হইত। কেহ কেহ উচ্চ চীৎকার করিয়া

আছাড় খাইয়া বেহুশ হইয়া পড়িত। অবশ্য পীর ছাহেব এই অবস্থা (তাছকীন) প্রশমিত করিয়া দিতেন। কাহাকেও নিয়ত ছাড়িয়া দিতে বলিতেন, কাহাকেও দুরূদ শরীফ পড়িয়া ফুঁক দিতেন ; ইহাতে আস্তে আস্তে উত্তেজনা কমিত।

কিন্তু তাওয়াজ্জোহ দানের মূল লক্ষ্য কেবল উত্তেজনা বাড়াইয়া দেওয়া নহে, বরং কল্‌ব রুহ, ছের্‌র্, খফি, আখফা, নফছ এবং আব্‌ আতশ খাক ও বাদ প্রভৃতি দেহের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম লতিফা এবং দেহের মৌলিক উপাদানগুলিতে আল্লাহ শব্দ জাগরিত করিয়া দেওয়া এবং বিচ্ছিন্ন মনকে আল্লাহতে নিবিষ্ট করিবার জন্য কেন্দ্রিভূত করা। ইহা তাওয়াজ্জোহ গ্রহণকারীরা সকলেই অনুভব করিতেন অতঃপর ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেন। তাওয়াজ্জোহের প্রতিক্রিয়া কেবল যে, মুরীদগণের উপর হইত তাহা নহে, বরং পীর ছাহেব কেবলার নিজের উপরেও পতিত হইত। প্রায় অবস্থায়ই তাওয়াজ্জোহ দানকালে তাহার কলবের উপর ভীষণভাবে আকর্ষণ আপতিত হইত। তিনি ইহাতে সজোরে শব্দ করিয়া উঠিতেন। সেই গভীর শব্দে সময়ে হাল্‌কার সকল শিক্ষার্থী সচকিত ও প্রকম্পিত হইয়া উঠিত। এরূপ একধিকবার হইত এবং চক্ষে অশ্রুধারা বহিয়া যাইত! কখনও ঘন ঘন শব্দ উত্থিত হইত। তিনি যে একটি ভীষণ বেগ নিজের মধ্যে ধারণ করিতেছেন ইহা আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতাম।

এবাদাৎ

পীর ছাহেব কেবলা প্রায়ই ওয়াজের প্রারম্ভে এই আয়াত শরীফ পাঠ করিতেন—

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين .

অর্থাৎ "তোমরা মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার প্রতিপালকের এবাদতে লিপ্ত থাক।" ইহা কেবল তাঁহার মুখের কথাই ছিল না। তিনি জীবনে ইহার জ্বলন্ত আদর্শ ছিলেন। তিনি এরশাদ করিতেন "দুনিয়ার সব কাজই নিয়ত এবং উদ্দেশ্যের দ্বারা এবাদতে পরিণত হইতে পারে।" ইহা আমরা পীর ছাহেবের জীবনের আমল দেখিয়া গভীর ভাবে প্রত্যয় করিয়াছি। কারণ, তাঁহার জীবনের মুহূর্ত্ত গুলিকে তিনি এমন ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন যে, তিনি উহাকে স্বুবর্ণ মুহূর্ত্তে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। নিরর্থক আলাপ অপ্রয়োজনীয় কথা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ক্রীড়া-কৌতুক, অবসর বিনোদন, শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ ইত্যাদি ধরণের কাজ আমার বিশ বৎসরাধিক সাহচর্য্যের জীবনে তাঁহার মধ্যে দেখি নাই বরং জোর করিয়া বলিতে পারি কেহই দেখে নাই। কারণ আল্লার অলীগণ একটি নিশ্বাসকে একটি জীবনের ন্যায় মূল্যবান মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহারা সময়কে আল্লাহর এবাদত ব্যতীত অন্য কাজে ব্যয় করেন না। একটি মুহূর্ত্ত ভূলক্রমে খোদার ইয়াদ ব্যতীত

ব্যয় হইলে তৎক্ষণাৎ তওবা-আছতাগফার করিয়া পুনঃ ইহার প্রতিকার করিয়া লওয়া তরিকৎ পন্থীদের প্রতি নির্দ্দেশ। সুতরাং যিনি সহস্র সহস্র লোককে তা'লীম তাওয়াজ্জোহের দ্বারা অহর্নিশ গঠন করার কাজে লিপ্ত থাকিতেন তিনি তাহার মুহুর্ত্তগুলিকে কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এখানে আমরা পীর ছাহেব কেবলার কতিপয় এবাদাতের কথা উল্লেখ করিতেছি।

নামাজ—নিজ দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে নামাজকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দিতেন।

অর্থাৎ "নামাজ আমার চোখের মণি"—এই হাদীছটি পীর ছাহেবের হৃদয়ে যেন বদ্ধমূল ছিল। নামাজের ওয়াক্ত আসিলে তিনি বিচলিত হইয়া উঠিতেন। চেহারায় একটা উৎকণ্ঠার ভাব পরিলক্ষিত হইত। ঘড়ি একটি সর্ব্বদাই নিজ পার্শ্বে রক্ষিত থাকিত। নামাজের ওয়াক্ত নিকটবর্ত্তী হইলে বার বার ঘড়ির দিকে চাহিতেন। ঘড়ি নিয়মিত সময় দিতেছে কি-না এরূপ সন্দেহ হইলে মছজিদে লোক পাঠাইয়া নিজ ঘড়ির সহিত সময় মিলাইয়া লইতেন। ঘন ঘন আজানের সংবাদ লইতেন। তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাজত সাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া মেছওয়াক ও ওজু সমাপন করিয়া নমাজের জন্য স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করিতেন। কখনও মছজিদের বারান্দায় বসিয়া কাপড় পরিধান করিতেন। নির্দ্দিষ্ট এমামের পিছনে নামাজ পড়িতেন। নামাজে একান্ত

ধীর স্থির এবং গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইতেন, মুখমণ্ডলে অস্বাভাবিক ভীতি বিহ্বলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত। সর্ব্বদা তিনি জামাতে নামাজ পড়িতেন। রোগে শয্যাগত ও উত্থান শক্তি রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও একা নামাজ পড়িতেন না। জামাতে নামাজ নামাজ পড়া সম্পর্কে রছুলুল্লার (দঃ) নির্দ্দেশ তিনি পূর্ণরূপে পালন করিতে কখনও অবহেলা করিতেন না। এমন কি, মছজিদে যাইতে অসমর্থ হইলে নিজ খানকার বারান্দায় পরিচর্য্যাকারীদের লইয়া জামাত করিতেন। দাঁড়াইতে অসমর্থ হইলে বসিয়াই জামাতে শরীক হইতেন। অন্তিম অসুখে যখন তিনি একান্ত দুর্ব্বল তখনও তিনি লোকের হাত ধরিয়া লাঠিতে ভর করিয়া মছজিদে যাইতেন এবং দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতেন। একবার পায়ে একটি ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক ফোঁড়া হইয়াছিল। উহাতে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল; তথাপী তিনি দাঁড়াইয়া ফরজ নামাজ আদায় করিতেন। তিনি শরিয়তে রোখছৎ উপর আমল না করিয়া অধিকাংশ সময়ে আজিমতের উপর আমল করিতেন। অর্থাৎ শরিয়তে অবস্থা গতিকে যে সকল বৈধ সুযোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে তিনি সাধ্য পক্ষে তাহা গ্রহণ করিতেন না।

জলপথে ক্ষুদ্র নৌকায় আমরা অনেক সময় একসঙ্গে ছফর করিয়াছি। সেই সকল নৌকায় দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করা সম্ভব হইত না; সুতরাং সেই অবস্থায় বসিয়া নামাজ পড়ার বিধানও রহিয়াছে; কিন্তু তিনি সেই সুবিধা

বর্জ্জন করিতেন এবং তীরে উঠিয়া নামাজ আদায় করিয়া আবার নৌকায় চলিতেন। তাহারাৎ, ওজু ও নামাজের ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত মোস্তাহাব সমূহ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহকীক করিতেন। প্রায়ই নামাজের মছলা সমূহ অধ্যয়ন করিতেন। অত্যন্ত ধীর ভাবে নামাজ আদায় করিতেন। কখনও ব্যস্ততার সহিত নামাজ পড়িতে দেখি নাই। ছেজদা, রুকু ইত্যাদি প্রত্যেকটী রোকন সুস্থির ভাবে আদায় করিতেন।

নফল নাম'জ—নির্দ্ধারিত নফল নামাজ সমূহ তিনি সর্ব্বদা পাঠ করিতেন। রাত্রে অল্প সময় নিদ্রাভোগের পরে জাগরিত হইতেন। তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করিয়া মোরাকাবায় বসিয়া যাইতেন। তাহাজ্জুদ নামাজ কখনও কাজা কারেন নাই। কখনও ফজরের আজানের পূর্ব্বে একটু শয্যাগ্রহণ করিতেন। কখনও ঐ অবস্থায়ই ফজরের আজান হইত, তিনি অজু করিয়া মছজিদে চলিয়া যাইতেন। যাহারা তখনও ঘুমাইয়া থাকিত তাহাদের জাগাইয়া দিবার জন্য কাহাকেও নির্দ্দেশ দিতেন। নিজ ছেলেদিগকে নিজেই জোরে জোরে ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইতেন এবং জামাতে হাজীর করিতেন। ফজরের নামাজ বাদ এশরাক পর্য্যন্ত ওজিফা কোন ক্রমেই বাদ পড়িত না। এশরাকের পরে দীর্ঘ সময় মোরাকাবা ও নফি এছবাত ইত্যাদি নিজ করণীয় ওজিফা আদায় করিতেন এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ১০টা কখনও ১১টা পর্য্যন্ত অজিফায় অতিবাহিত করিতেন। চাশ্‌ত নামাজ

প্রায়ই নিজ বৈঠক খানার বারান্দায় এবং ছফরে থাকিলে যেখানে সময় হইত সেইখানেই পড়িয়া লইতেন। তাহইয়াতুল ওজু সব সময়ই পড়িতেন। জোহর এবং আছরের নামাজের পর কোরআন মজিদ ও দালায়েল খায়রাত পাঠ করিতেন। ওজিফা মোরাকাবা ও তা'লীম তাওয়াজ্জোহের নিয়মিত কর্ত্তব্য ছাড়া অবশিষ্ট সময় নানাবিধ কথা ও কাজের ভিতরেও তছবীহ হাত হইতে পৃথক হইত না এবং অন্তর জেকরে লিপ্ত থাকিত।

এত্তেবারে ছুন্নৎ—পীর ছাহেব কেবলা একজন খাটী আশেকে রছুল ছিলেন। সকল কাজে কেতাব অনুযায়ী রছুলুল্লাহ্ (দঃ) নীতি অতি দৃঢ় ভাবে অনুসরণ করিতেন। উহাকে কিছু মাত্র হাল্‌কা মনে করিতেন না। কেহ উহার প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করিলে তিনি বরদাশ্‌ত করিতেন না। ছুন্নৎ তরীকা যেমন নিজে আমল করিতেন তেমন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। লেবাছ পোষাকে ইছলামী ধারা এবং রছুলুল্লার (দঃ) ছুন্নৎ অতি কঠোর ভাবে অনুসরণ করিতেন এবং নিজ অনুবর্ত্তীগণকে করাইতেন। তিনি নিজে মুহুর্ত্তের জন্য প্রকাশ্যে কি বির্জ্জনে খালি মাথায় থাকিতেন না। নিদ্রার সময়ে মাথার টুপী রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। কচিৎ ঘুমের ঘোরে মাথা হইতে টুপী খসিয়া গেলে খেয়াল হইবা মাত্রই পুনঃ মাথায় টুপী সংস্থাপিত করিতেন। নামাজে পাগড়ী ব্যবহার ছুন্নত তাই

তিনি সর্ব্বদাই উহা ব্যবহার করিতেন। কচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়াছি। পাজামা অথবা লুঙ্গী পরিধান করিতেন। পাজামার ঝুল হাটুর নালার মাঝামাঝি হইতে একটু নীচে এবং পায়ের গোড়ালীর অনেক উপরে থাকিত। পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত পাজামা কখনও পড়িতে দেখি নাই। গোড়ালীর নীচে ঝুলাইয়া দেওয়া নাজায়েজ। ঐরূপ কাহাকে করিতে দেখিলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। লম্বা জামা হামেশা পরিধান করিতেন। জামার হাটুর নিম্ন পর্য্যন্ত ঝুল থাকিত। বুকভরা দাড়ি রক্ষা করিতেন। ওষ্ঠের উপরি ভাগে যে মোঁচ লম্বা হইয়া পানাহারে ব্যাঘাত ঘটাইত তাহা তিনি পরিমিত পরিমাণ খাট করিতেন। দাড়ি সাদা হইলে মেহেদী রঞ্জিত করিয়া রাখিতেন। প্রায় প্রত্যেকবার ওজুর পূর্ব্বে মেছওয়াক করিতেন। আচকান, চোগা, জরীর টুপী, বাঁধান পাগড়ী, ছোট রুমাল, আংটী, ওয়াচকোট, কলারওয়ালা জামা, কিংবা ডারবী জুতা কখনও ব্যবহার করিতে দেখি নাই। ইহার কোনও কোনওটা ব্যবহার করা মকরূহ, কোনটা তাকওয়া বিরোধী, কোনটা সৌখিনতার চিহ্ন বলিয়া ব্যবহার করিতেন না। অধিকাংশ সময়েই সাধারণ মূল্যের সাদা পোষাক পরিধান করিতেন। পুরাতন তালিযুক্ত বা ছেড়া, সেলাই করা পাজামা কোর্ত্তা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। দরজীর ভুল বশতঃ অথবা অন্যকোন কারণে কোরতা যেটুকু লম্বা হওয়া উচিত তাহা হইতে দুই এক

অঙ্গুলী ঝুল কম হইলে অন্য এক টুকরা কাপড় জোড়া দিয়া পরিধান করিতেন। পূর্ণ হাতা বিশিষ্ট কলিদার নিমা পরিধান করিতেন। ইস্তারী বা ধোপা বাড়ীর ধোপ দেওয়া কাপড় পরিধান করিতে দেখি নাই। তবে লেবাছ পোষাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। তিনি সর্ব্বদাই চটিজুতা পরিধান করিতেন। মোটকথা লেবাছ পোষাকে ছুন্নতের পূর্ণ পাবন্দী করিতেন। বিলাসিতা, সৌখিনতা কিংবা বোজর্গানে দ্বীনের আদর্শের বিপরীত কোনও লেবাছ পোষাক পরিধান করিতেন না।

পানাহার—বাল্যে এবং যৌবনে পীর ছাহেব খানাপিনার প্রতি কিরূপ আসক্ত ছিলেন তাহা বলিতে পারিনা তবে তরিকায় পূর্ণ লাভের পর হইতে এবং আমাদের দীর্ঘ সাহচর্য্যের জীবনে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাই এখানে বর্ণনা করিতেছি। ভোরে তিনি নাস্তা করিতেন না। বহুদিন আমরা এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছি। অবশ্য পরে বৃদ্ধ বয়সে চিকিৎসক-গণের এবং আমাদের পীড়াপীড়িতে একটু একটু দুধ সেবন করিতেন। ক্ষুধা অনবরতই সহ্য করিতেন। সঙ্গী-সাথী, মুরীদ ও কর্ম্মচারী যাহারা প্রতিনিয়ত হুজুরের সঙ্গে থাকিতেন তাহাদের জন্য কোন নাস্তার ব্যবস্থা হইত না এবং তিনিও নাস্তা গ্রহণ করিতেন না। সেই এগারোটা কি বারোটায় একটি মাটির বর্ত্তনে তিনি খানা খাইতেন। তাহাও আবার চাউলের সাদা ভাত ও একটি মাত্র তরকারি। তরকারীতে তৈল মরিচ থাকিতনা বলিলেই চলে। অবশ্য আমরা

ভক্তরা, ভুক্তাবশিষ্ট অনেক সময় খাইতাম এবং বলিতাম "আহা! ইহা যে অমৃত!"—ভক্তির রসে সিক্ত থাকিত বলিয়া উহাকে অমৃত বলা হইত নতুবা উহা কাহারও মুখে রুচিতো না। সামান্য তৈল বা নাম মাত্র ২।১টা লবঙ্গ এলাচি এবং পানির উপকরণে বাচ্চা মুরগী বা মাছের ঝোল একান্ত রুগ্ন ব্যক্তির পথ্য বিশেষ! উহাই তিনি খাইতেন। কচিৎ কদাচিৎ দু'টা তরকারি খাইতেন। কখনও শুধু ডাল দিয়া খানা শেষ করিতেন। খাদ্যের পরিমাণ একান্তই কম ছিল। একটি সবল, কর্ম্মী, পরিশ্রমী, সুপুষ্টদেহী মানুষের এত অল্প খাদ্যে কি করিয়া চলিত তাহা চিন্তার বিষয় ছিল। ইহা নিশ্চিত যে তিনি সেই সামান্য পরিমাণ খাদ্যে পেট পূর্ণ করিতে পারিতেন না কেবল জীবন ধারণ এবং কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্যই আহার গ্রহণ করিতেন। বস্তুতঃ ছুন্নৎ তরীকা অনুযায়ী পেটের তিন অংশের এক অংশ খাদ্যে, এক অংশ পানিতে পূর্ণ করিয়া অপর অংশ খালি রাখিবার বিধান রহিয়াছে। পীর ছাহেব কেবলা ইহা পূর্ণরূপে পালন করিতেন।

দ্বিপ্রহরের পরের দিকে দেখিতাম, তিনি ক্ষুধায় কাতর হইতেছেন। এই সময় কখনও খানিকটা দুধ, এক পেয়ালা চা, কিংবা কখনও আধ-ঝুনা নারিকেলের পানি বা খালি নারিকেল খাইতেন। ইহার পর সেই রাত্রে এশার নামাজের পর সকাল মেহমানের খাওয়া শেষ হইয়া গেলে লঙ্গর খানার বাবুর্চ্চিকে ডাকিয়া সকলের খানা শেষ হইয়াছে

কিনা, ভাতে পোষাইয়াছে কিনা, এসব সংবাদ লইয়া তবে তিনি খাইতে বসিতেন। কিন্তু ইহাও সহজ ছিল না। মেহমান অবিশ্রান্ত ধারায় আসিতে থাকিত। খাওয়া দাওয়া চলিতে থাকা কালে যাহারা আসিতেন তাহাদিগকে আমরা মেহমান খানায় কোনরূপে পোষাইয়া লইতাম। একসঙ্গে বসিয়া খানা খাইবার 'বরকত' তখন আমরা অনুভব করিতাম। কিন্তু অব্যবহিত পরে যাহারা আসিতেন, তাহাদের জন্য ব্যবস্থার চিন্তা হুজুরকেই করিতে হইত। নিজ পরিবার বর্গে কিংবা মেহমানগণের একটি লোককেও জ্ঞাতসারে অভুক্ত রাখিয়া পীর ছাহেব কখনও খানা গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং নবাগত মেহমানদের জন্য পরিশ্রান্ত বাবাবুর্চ্চিগণকে পুনরায় পাক করিতে বলিতে হুজুরের বাঁধিত; তাই তিনি অন্দরের দিকে চলিয়া যাইতেন এবং যাহা সম্ভব তাহাই লইয়া আসিয়া মেহমানদের জন্য হাজির করিতেন। বহু সময় এরূপ ঘটিয়াছে যে, আম্মা ছাহেবারা খাইতে বসিয়াছেন এদিকে মেহমান আসিয়াছে; মেহমানের সংবাদ পাইয়া তাঁহারা আর এক লোকমাও গ্রহণ করেন নাই, মেহমানদের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন! এই ধরণের ঘটনা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ছিল। কখনও বা অন্য ব্যবস্থা না করিতে পারিলে হোটেল হইতে কিনিয়া খাইবার জন্য নিজ পকেট হইতে পয়সা দিয়া দিতেন। এসব ব্যবস্থাদির পরই তিনি নিজ খানা খাইতেন। বাড়ীতে কিংবা ছফরে সর্ব্বত্রই মেহমানদের সম্পর্কে এইরূপ

ব্যবস্থা ছিল। আমরা একথা শুনিয়াছি যে, তিনি প্রথমে বাড়ীতে মেহমানদের সঙ্গে বসিয়াই খানা গ্রহণ করিতেন। পরে অবশ্য ভক্ত ও প্রবীন সঙ্গীগণের বিশেষ অনুরোধে নঙ্গর খানায় বসিয়া ভাত খাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, পীর ছাহেবের সম্মুখে যে মুরীদগণের বাক্য স্ফুরণ হইত না, কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে যাহাদের প্রাণ দুরু দুরু করিত, উচ্চ শব্দের কথা ও হাসি অন্তর্হিত হইয়া যাইত; তাহারা পীর ছাহেবের সঙ্গে একাসনে, এক বিছানায় একত্রে বসিয়া খাইতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও জড়সড় হইয়া পড়িতেন। সুতরাং পীর ছাহেবকে অন্যত্র বসাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে সকলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাচে। দরবারের বিচক্ষণ প্রবীন সঙ্গীগণ তাই নানা আপত্তি ও অজুহাত তুলিয়া পীর ছাহেবকে পৃথক স্থানে খাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বিচক্ষণ সহচরগণের এই পরামর্শের মধ্যে হয়তো আরও একটি রহস্য ছিল—তাহা এই যে, পীর ছাহেব নিজ বাড়ীতে থাকিয়াও কেবল মেহমানের দায়ে আপন সহধর্ম্মিনীদ্বয়কে খাদ্য পরিবেশন করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতেন। ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রের প্রাণে না বাজিয়া পারিত না। কাজেই ভক্ত এবং সহচরগণের জন্য পীর ছাহেবের এই ত্যাগের দিকটা সকলের প্রাণেই গভীর রেখাপাত করিয়া ছিল তাই তাহারাও ভক্তিপ্লুত প্রাণের নিগুঢ়তম কোনে লুক্কায়িত এই

'না বলা' আবেদনটী আকার ইঙ্গিতে নিবেদন করিয়া পীর ছাহেবকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। হয়ত পীর ছাহেবের প্রাণেও সে আবেদনের যৌক্তিকতা ছায়াপাত করিয়াছিল তাই শেষ পর্য্যন্ত তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও সব সময়ের জন্য নহে। বাড়ীতে মাহফিলের সময় তিনি সর্ব্বদা বহির্ব্বাটীতেই নিজ খানা আনাইয়া খাইতেন। কিন্তু যেখানেই তিনি খানা গ্রহণ করুন না কেন, মেহমানদের জন্য যে ব্যবস্থা হইত তদাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। একটি ঘটনা শুনুন ঃ—

তবলীগি ছফরে বোটে করিয়া চলিয়াছি। দুপুরের খানা পাক হইয়াছে। খাবার সময় উপস্থিত। পীর ছাহেব কেবলা সকলকে খানা খাইতে আদেশ করিয়াছেন। বাবুর্চিকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পাক করিয়াছ?" বাবুর্চি উত্তর করিলেন—"হুজুর! ডাইল পাক করিয়াছি।" হুজুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার জন্য কি পাক করিয়াছ?" হুজুরের খানা পৃথক পাক করা হইত, কারণ তাঁহার জন্য তখন ভাত খুব বেশী সিদ্ধ করিয়া নরম করিতে হইত এবং তরকারী, তৈল ঝাল বর্জিত করিয়া পাকাইতে হইত। যাহা হউক, হুজুরের প্রশ্ন শুনিয়া বাবুর্চি সভয়ে উত্তর করিলেন—"হুজুর, আপনার জন্যে বাচ্চা মুরগী!" বলার সঙ্গে সঙ্গেই পীর ছাহেব গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন—"আমার জন্য ফেরাউনী খানা পাকাইয়াছ!"

রাগে হুজুরের চেহারা কঠোর ভাব ধারণ করিল। বাবুরচি যেন মরিয়া গেলেন। মেহমান এবং সঙ্গীদের মধ্যে খানার এতাদৃশ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, একদিকে মুরগী, অন্য দিকে ডাইল, তাতো কোন দিনই হয় নাই। সেদিন এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল! কিন্তু তেমন কোন অপরাধও যে বাবুরচি করিয়াছিলেন আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। হুজুরের দায়িত্ব কতো বেশী, তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্যও খাওয়া দাওয়া একটু ভালো হওয়া দরকার। অন্যান্যের তুলনায় প্রতি দিন কতো কঠোর পরিশ্রমই না তাঁহাকে করিতে হইতেছে—সহস্র সহস্র লোকের ঝামেলা আরজু-আব্দার তাঁহাকে মিটাইতে হইতেছে; বৈঠকে, সভায় অনবরত ওয়াজ নছিহত করিতে হইতেছে; তা'লীম তাওয়াজ্জুহ দিতে হইতেছে; দীর্ঘ রাত্রি জাগরণ করিতে হইতেছে, তদুপরি বার্দ্ধক্য জনিত ক্লান্তিতো রহিয়াছেই। সেই অবস্থায় হুজুরের জন্য বাবুরচি তাহার সাধারণ জ্ঞান অনুসারেই একটী বাচ্চা মুরগী পাক করিয়াছিলেন। অবশ্য আমাদের জন্য যে শুধু ডাইল পাকানো হইয়াছিল তাহা কোন বৈষম্য মুলক ব্যবস্থা হিসাবে করা হয় নাই; আমরা বহুলোক, সময় সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আমাদের জন্য খানা পাকানো হইত। আল্লাহর মেহেরবাণী এবং হুজুরের নেক দোয়ার বরকতে খাদ্য খাদকের কোন অভাব আমাদের ছিল না. মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা করিয়াই অন্যান্য

ঝামেলার হাত হইতে বাবুরচিকে রেহাই দেওয়ার জন্য আমরা ডাইল খাইবার ব্যবস্থা নিজেরাই করিতাম। এমতাবস্থায় পীর ছাহেব কেবলার জন্য সাধারণ একটী বাচ্চা মুরগী পাক হওয়ায় কাহারও মনে কিছু উদয় হওয়াতো দূরের কথা; বরং সকলেই খুশী হইতাম; কারণ; হুজুর যাহাতে একটু ভাল খান, বেশী খান, বেশী বিশ্রাম লইতে পারেন ইহা আমাদের সকলেরই কাম্য এবং সকলেরই চেষ্টার বিষয় ছিল। কিন্তু আমরা যতোই তোয়াজ তোষামোদ দ্বারা হুজুরকে তাঁহার কোন নিয়ম ও আদর্শ হইতে এতটুকুও নড়াইতে পারিতাম না। যাহা হউক, বাবুরচি এরূপ কাজ করিয়া বড়োই বিপদে পড়িয়াছিলেন; কারণ; পীর ছাহেব কেবলার সঙ্গে চলায় আর কোন বিপদ ছিল না, একমাত্র বিপদ ছিল, কোন কারণে পীর ছাহেব কেবলা রাগান্বিত হইলে সকলেরই প্রাণ উড়িয়া যাইত। ইহা সকলের পক্ষেই একটি সাক্ষাৎ 'মুছিবতের' ন্যায় মনে হইত। সুতরাং বাবুরচি সহ আমরা সকলেই সেই নদীগর্ভে এক মুছিবতে পড়িলাম। ইহার পর, সঙ্গীদের মধ্যে যাহারা প্রবীণ এবং সাহসী ছিলেন তাহারা অগ্রসর হইয়া নানাবিধ ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া এবং আমাদের জন্য ডাইল পাকাইবার যুক্তি যুক্ত কারণ পেশ করিয়াও হুজুরকে মুরগীর তরকারী গ্রহণ করানো গেল না। পরে হুজুর হুকুম করিলেন—"উহা তোমরা খাও, আমার জন্য ডাইল আনো!" অগত্যা সেই ভাবেই ব্যবস্থা হইল।

পীর ছাহেবের জন্য এবং আমাদের জন্য কি কি পাক করা হইবে বাবুরচি ছাহেব তাহা প্রত্যহই পীর ছাহেবের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মোতাবেক পাক করিতেন। ছফরে আমরা প্রাচুর্য্যের সঙ্গেই খাইতাম। মাছ, গোশ্‌ত দুধ দধি সময়ে অপরিমিত জুটিয়া যাইত। আমরা জেয়াফত করিয়া পরমোল্লাসে খাইতাম। হুজুর তাহা মোটেই খাইতেন না, কারণ আমরা তরকারীতে তৈল ঝাল বেশী খাইতাম, কিন্তু হুজুর উহা খাইতেন না। খাদ্য সামগ্রীর অত্যধিক জৌলুশ দেখিলে হুজুর যেন শিহরিয়' উঠিতেন। তৈলে মরিচে অত্যধিক চক চকে তরকারি দেখিলে হুজুর খুশীর চেয়ে 'বেজার' বেশী হইতেন এবং আমরা যাহাতে থাওয়া-দাওয়ায় খুব স্বাদ আস্বাদের অন্বেষণ না করি, সে বিষয় পীর ছাহেব আমাদের নছিহত করিতেন। দুই একদিন বোটের উপর তলায় উঠিয়া আমরা কি ধরণের তরকারী পাকাইয়া খাইতাম তাহা তিনি চাহিয়া লইয়া দেখিতেন এবং নছিহত করিতেন। কিন্তু ভাল খাইবার লোভ কি আর আমরা ছাড়িতে পারিতাম! আমরা বেশী তৈল ঝাল দিয়া পরমোল্লাসে মাছ, গোশ্‌ খাইতাম। হুজুর অবশ্য জানিতেন সবই কিন্তু প্রায়ই চুপ করিয়া সহ্য করিতেন।

যে কোন অবস্থাই হউক, খাদ্য খাদকের ব্যাপারে হুজুর কখনও নিজ সঙ্গীদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা কবুল করিতেন না।

আর একটি ঘটনা শুনুন :—

রমজান মাস। ইহাই সম্ভবতঃ হুজুরের জীবনের সুস্থাবস্থায় শেষ রমজান। বাড়ীতে একজন হাফেজ ছাহেব খতম তারাবী পড়াইবার জন্য স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন। কোন রুজী রোজ-গারের নিয়তে নয়, শুধু মাত্র হুজুর কেবলাকে খতমে কোরআন শুনাইবার নিয়তেই তিনি আসিয়াছিলেন। খতম তারাবী চলিতেছে। হুজুরের মোছাফেরখানার খানা পিনা প্রায়ই সাধারণ স্তরের হইত। বহুলোকের খানা একত্রে পাক হইত। তার মধ্যে প্রায়ই নূতন আগন্তুক ভর্ত্তি করিয়া লইতে হইত। তাই সেই মাহে রমজানে আমরা যাহার শুধু "খাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকি" তাহাদের একটু অসুবিধা হইত বৈ কি! আমরা সেই হিসাব করিয়া মনে মনে ধারণা করিলাম, হাফেজ ছাহেবের খুবই অসুবিধা হইতেছে। মাহে রমজান তদুপরি খতম তারাবী পড়াইবার তকলীফ, কাজেই তাহার জন্য একটু ভাল ব্যবস্থা দরকার ছিল। এই মনে করিয়া আমরা কয়েকজন পরামর্শ করিয়া হাফেজ ছাহেবের জন্য হুজুরের নিকট ভিন্ন তরকারীর আরজি করিলাম এবং উহা আমরা নিজেদের পক্ষ হইতে করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ইহাতে পীর ছাহেব কেবলা যেন পরে মনে একটু আঘাত পাইলেন। এবং বলিলেন—"আমিতো উহাই খাই, ভালো কিছু খাই না।" আমরা সলজ্জভাবে চুপ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, এমন তরো প্রস্তাব করা মোটেই সমিচীন হয় নাই। পরে

হাফেজ ছাহেবকে নিজ পকেট হইতে টাকা দিয়া ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন।

হুজুরের জন্য ছফরে বাড়ীতে কিংবা যে কোনো স্থানেই হউক, যে খানার ব্যবস্থা হইত তাহা কখনও চূড়ান্তভাবে খাইয়া শেষ করিতে দেখি নাই। হুজুরের জন্য যে ভাত রান্না করা হইত উহা একটি ক্ষুদ্র বালক অনায়াসে খাইয়া শেষ করিতে পারিত; কিন্তু সেই সামান্য পরিমাণ সাদা ভাত কখনও তিনি খাইয়া শেষ করেন নাই। কিছুটা রাখিয়া দিয়াছেন কিংবা রহিয়া গিয়াছে। খাদেম ও সঙ্গীরা উহা সময়ে ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছেন, কখনও বা পীর ছাহেব কেবলা নিজেই উহা কাহাকেও দিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেন। কখনও কোনও ক্ষুধার্ত্ত আগন্তুক আসিয়া পড়িয়াছে; অথবা কেহ মনে মনে পীর ছাহেবের একটু তাবাররক খাইবার নিয়ত করিয়া আসিয়াছে তাহাদের কেছমতে জুটিয়া গিয়াছে।

পীর ছাহেব কেবলা কোন জিনিষ একা খাইতেন না। সামান্য একটু চা তৈয়ারী হইলেও তাহা তিনি অর্দ্ধেকের একটু বেশী বা কম পান করিয়া অবশিষ্টটুকু সঙ্গীদের দিয়া দিতেন। এমন প্রায়ই ঘটিত। হুজুরের জন্য পোয়াটাক পরিমাণ চা তৈয়ার হইত হুজুর খানিকটা পান করিতেন বাকীটুকু আমরা উপস্থিত সকলে ঢোক ঢোক সকলে ভাগ করিয়া পান করিতাম।

বাড়ীতে কিংবা ছফরে হুজুরের নিকটে নানাবিধ ফল ফলাদি 'হাদীয়া' স্বরূপ আসিত। উহা যথেচ্ছভাবে খরচ করিবার হুকুম ছিল না। এযাজত ব্যতীত সামান্য একটি জিনিষও স্পর্শ করিবার বা এদিক সেদিক করিবার সাহস কাহারও ছিল না। হাদীয়ার ফল-ফলাদী সম্ভব মতো জমিয়া গেলে অথবা কোনো জিনিষ নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে উহা তিনি বহু ভাগে বণ্টন করিয়া সকলকে দিতেন। মোছাফের খানার অতিথি, মাদ্রাছার শিক্ষকবৃন্দ, খাদেম, কর্ম্মচারী এবং এইরূপ আরও বহুজনের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহার পর নিজ অন্দর বাড়ীতে কিছু পাঠাইতেন। সময়ে এরূপ ঘটিয়াছে যে, আমাদের ভাগে একটি পেয়ারা, দুইটী আমড়া কিংবা একটি খেজুর অথবা দুইটী কলা পড়িয়াছে। বণ্টনের সময় আমরা কেহ অনুপস্থিত থাকিলে অন্য কাহারো দ্বারা উহা আমাদের কোঠায় পাঠাইয়া দিয়াছেন অথবা নিজে কোথাও রাখিয়া দিয়াছেন। পরে সাক্ষাৎ হইলে চুপে বলিয়াছেন— "তোমার জন্য অমুক জিনিষটি অমুক স্থানে রাখা আছে, যাও নাও গিয়া।" এইরূপ যাহারা কয়েকজন হুজুরের প্রতিবেশী হিসাবে সপরিবারে শর্ষিনায় আসিয়া রহিয়া গিয়াছেন; তাহাদের প্রতি সর্ব্বদাই হুজুর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। হাদীয়া বণ্টনের ব্যাপারে তাহাদের ছেলেমেয়ে এমনকি পরিবারের অতিথি অভ্যাগতগণের হিসাব করিতেন। প্রতিদিনের এরূপ কতো ঘটনা, কত অযাচিত স্নেহ মমতা, সমদৃষ্টি এবং বাৎসল্য

জিনিষ উত্তমরূপে খাইতেন। গোশ্তের হাড্ডি চিবাইয়া, বর্ত্তন উত্তমরূপে চাটিয়া এবং প্রত্যেকটী অঙ্গুলী ভালভাবে চুষিয়া খাইতেন। আমরা অনেক সময় হুজুরের সম্মুখে বড় লোকদের খাওয়া-পেওয়ার ফ্যাসন অর্থাৎ অপচয় সম্পর্কে আলোচনা করিতাম। হুজুর উহা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেন এবং দুঃখ করিতেন। খাওয়া শেষ হইলে অনেক সময় বর্ত্তনে পানি দিয়া ধৌত করিয়া তিনি খাইতেন, অবশ্য ইহা সব সময় দেখি নাই।

খাওয়া দাওয়ায় সংযম সাধনের ব্যাপারে হুজুরের জীবনে বহু ঘটনা রহিয়াছে।

দেশের অভাব অনটন এবং বিপদ আপদের সময় তিনি খানা পিনার ব্যাপারে আরও সংযত হইতেন। নিজের পরিবার বর্গকেও সংযমী হইতে উপদেশ দিতেন। কখনও কখনও বাড়ীর ভিতরে গোশ্ত খাওয়া কিংবা পিঠা খাওয়া বন্ধ করিয়া দিতেন, বলিতেন—"দেশের লোক ভাত পায়না এই সময় আয়োজন করিয়া ভালো খাওয়া ত্যাগ করো।" একবার দুর্ভিক্ষের সময় বহুদিন পর্য্যন্ত বাড়ীর ভিতরে মিঠা পিঠা কিংবা কোন আয়োজনের খানা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

একবার ঈদ উপলক্ষে বাড়ীর ভিতরে ছেলে মেয়েরা সামান্য কিছু খাওয়ার আয়োজন করিয়াছিল। তখন পীর ছাহেব বরিশালের অঞ্চল বিশেষের জন্য রিলিফের টাকা পয়সা সংগ্রহ করিয়া করিয়া দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করিতে-

ছিলেন। সেই সময় তিনি ছেলেদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঈদের খুশীতে সবাইকে সামিল করিতে হয়। এস আমরা সবাইকে নিয়া ঈদ করি।" এই ভাবে বুঝাইয়া ঈদের বরাদ্দকৃত খরচের এক অংশ উক্ত রিলিফ তহবিলে জমা দিয়া দিয়াছিলেন।

তাকওয়া
(খোদা ভীতি)

ইছলামের প্রাণশক্তি নিহিত রহিয়াছে তাক্ওয়ার ভিতরে। তাক্ওয়া যাহার ভিতরে যত বেশী তিনি তত বেশী ইমানদার এবং আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞান তাহার ততো স্পষ্ট। পীর ছাহেব কেবলার জীবনে আমরা উঁচু স্তরের তাকওয়া লক্ষ্য করিয়াছি। সে তাক্ওয়ার সামনে তিনি দুনিয়ার সকল মায়া হইতে দূরে রহিয়াছেন। পীর ছাহেবের জীবনের যে সকল ঘটনা এযাবৎ আমরা উল্লেখ করিয়াছি উহার মূলে যে তাক্ওয়া ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহার অধিক পরিমাণ তাক্ওয়া ছিল বলিয়াই তিনি জীবনে আল্লাহ্র হুকুমকে অতি দৃঢ় ভাবে আকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কম বেশী প্রত্যেক মুছলমানের মধ্যেই কিছু না কিছু তাক্ওয়া রহিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন—"'আমাকে যথার্থরূপে ভয়কর'।" আল্লাহ্তায়ালা আরও বলিয়াছেন,—'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে

আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যে অধিকতর মোত্তাকি।" সুতরাং অধিকতর তাক্‌ওয়ার অধিকারী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাশীল এবং আল্লাহ্‌র বন্ধুরূপে পরগণিত। পৃথিবীতে তাঁহারা ওলী, দরবেশ, গওছ কুতুব ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকেন। তাকওয়ার প্রথম কথাই হইল আল্লাহ ও রছুলের প্রতি পূর্ণ ইমান আনয়ন করা এবং ইহার পরিণতির কোন শেষ নাই। বিভিন্ন ওলী আউলিয়ার ভিতরে উহা বিভিন্ন রূপে বিকাশ লাভ করে। আগুনের দাহিকা শক্তি নিকটবর্ত্তী জনকে তাহার উত্তাপ সম্পর্কে সজাগ করিয়া দেয়; স্নিগ্ধ শীতল পানির নিকটে বসিলে তাহার স্নিগ্ধ পরশ নিকটবর্ত্তী জনকে তাহার চরিত্র জানাইয়া দেয়। সেইরূপ যাহারা আল্লাহ্‌র ওলী, অধিকতর মোত্তাকী, তাহাদের সান্নিধ্যে বসিলেই তাক্‌ওয়ার স্বাদ অনুভব করা যায়। হজরত পীর ছাহেব কেবলার সান্নিধ্যে বসা মাত্রই উহা অনুভব করা যাইত। লোক হাসিতে হাসিতে আসিত আর ফিরিয়া যাইতে চক্ষুভরা ভয় বিগলিত অশ্রু লইয়া। দিবারাত্র দলে দলে নিত্য নূতন লোক হুজুরের নিকট আসিয়াছে; হুজুরের পার্শে উপবেশন মাত্রই তাঁহাদের প্রাণ আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। মন হইতে নানা দ্বিধা সংশয়ের ধাঁধাঁ টুটিয়া গিয়াছে। ক্ষণিকে তাহারা যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে; গুনাহের কথা মনে হইয়াছে। তওবা করিবার জন্য আকুলি ব্যকুলি ও চক্ষে দরবিগলিত

ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি। কতো লোক কতো পার্থিব কল্পনা লইয়া আসিয়াছে, কত কুট প্রশ্ন, কতো সন্দেহ লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু হুজুরের পবিত্র চেহারার প্রতি দৃকপাত মাত্র তাহারা মুহূর্ত্তে সকল বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মনের পার্থিব কল্পনাগুলি, সংশয় সন্দেহগুলি এবং কুট প্রশ্নগুলি কর্পূরের মতো বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহারা কি বলিতে আসিয়াছিল তাহাদের মনে কি ছিল তাহা আর তাহারা খুঁজিয়া পায় নাই। ইহার কারণ কি ছিল? ইহার ইহার কারণ এই ছিল যে, হুজুরের হৃদয়ে সর্ব্বদা আল্লাহ্‌র ভয় গভীর ভাবে জাগরিত ছিল। একটি মুহূর্ত্তও আল্লাহ্‌র ভয় হইতে তাঁহার হৃদয় মুক্তি ছিল না। সেই জন্যই যে কেহ হুজুরের সান্নিধানে বসিতেন তাঁহার হৃদয়ে উক্ত তাক্‌ওয়ার প্রভাব আসিয়া পড়িত। একটি লোক যদি বেদনায় উহা আহ্‌ করিতে থাকে তবে তাহার নিকট কেহই বসিয়া হাসিতে পারিবে না, দর্শকের হৃদয়েও বেদনা স্পর্শ করিবে। সেইরূপ আল্লাহর ভয়ে সদা বিহ্বল একজন ওলীর সান্নিধ্যে বসিলে মানুষের মন ভীত ও জাগরিত হইয়া ওঠে। আল্লাহর অধিকতর মোত্তাকী বান্দার ইহাই উজ্জ্বল প্রমাণ। পীর ছাহেবের এই গভীর তাক্‌ওয়া তাঁহার সারা জীবনের সকল কাজের ভিতর জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়াছে। হুজুরের মুখে অনাবশ্যক কথা, ঠাট্টা বিদ্রূপ, অট্টহাসি গল্প, নিন্দা বা আত্ম প্রশংসা শুনিতে পাই নাই! ইহা তাহার

সদাজাগ্রত তাক্‌ওয়ার প্রমাণ যিনি নিজের ভাবনায় সর্ব্বদা নিমগ্ন তিনি পরের চর্চ্চা কখন করিবেন? হুজুরের দরবারের একজন বিশিষ্ট এবং জীবনের অন্যতম সঙ্গী বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের ত্রিশ বৎসরের অধিকাল সাহচর্য্যের জীবনে পীর ছাহেব কেবলা উক্ত সঙ্গীর পিতার নাম জিজ্ঞাসা করেন নাই বা তাঁহার সাংসারিক অবস্থা কি তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। ইহার কেন করেন নাই। ইহার কোন প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই। কথাটি ভাবিবার বিষয়! ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল সাহচর্য্যের ভিতরে যেখানে প্রায় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে, দিন রাত্রি অজস্র কথোপকথন আলাপ আলোচনা চলিয়াছে সেখানে প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া তিনি এমন একটি স্বাভাবিক প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেন নাই। অপ্রয়োজনীয় কথা হইতে তিনি কিরূপ দূরে থাকিতেন ইহা দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম, ফরজ সমূহের প্রতি বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিলেন। সেইরূপ আল্লাহ্‌র নিষেধ— হারাম সমূহকে জলন্ত আগুনের ন্যায় ভয় করিতেন। তাই যাহারা আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে, তাহাদের সহিত তিনি আল্লাহ্‌র ভয়েই খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফিরা, মিলা-মিশা, সাদী, বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগকে তিনি বিতাড়িত করেন নাই বরং সদ্ব্যবহার দ্বারা হেদায়েত করিয়াছেন। সন্দেহযুক্ত

উপার্জ্জনের এক পয়সা হইতে সহস্র সহস্র টাকা সমানভাবে উপেক্ষা ও বর্জ্জন করিয়াছেন। কখনও কাহারও হাদীয়া প্রভৃতি গ্রহণ করিবার পর যদি জানিতে পারিতেন, যে উহা সন্দেহ যুক্ত, তাহা হইলে তখনই হাদীয়া ফিরাইয়া দিতেন। গৃহীত দ্রব্যটি ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব না হইলে উহার মূল্য প্রদান করিতেন। একবার পীর ছাহেব কেবলার জনৈক সঙ্গী ছাত্রাবস্থায় পীর ছাহেবের সঙ্গে কোথাও ছফরে গিয়াছেন। সেখানে ঘটনাক্রমে এক বাড়ীতে তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং এক বেলা আহার করেন। পরে জানা গেল যে দাওয়াতকারী সুদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা জানিতে পারিয়া পীর ছাহেব সেই ছাত্র সঙ্গীর দ্বারা এক বেলা খানার আনুমানিক মূল্য উহাকে ফেরত দিয়াছিলেন।

পীর ছাহেব কেবলা কয়েক শ্রেণীর লোকের দাওয়াত ও হাদীয়া কোনও দিন গ্রহণ করেন নাই। কারণ তাঁহাদের পেশা সম্পর্কে পীর ছাহেব নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই! যদিও সেই সব শ্রেণীর বহু লোক পীর ছাহেবের মুরীদ ছিলেন। একটী ঘটনা শুনুন:

একদিন পীর ছাহেব কেবলার সঙ্গে একা আমি বরগুনা হইতে ষ্টীমারে চড়িয়াছি। ফুরফুরা শরীফের মাহ্‌ফলে যোগদান করিবার জন্য আমাদের এই যাত্রা। অন্যান্য সঙ্গীরা হুলার হাট হইতে ষ্টীমারে উঠিবেন। পথে খাইবার জন্য চাউল ও ডিম সঙ্গে লইয়াছিলাম। ষ্টীমারে বসিয়া

নিজেই খানা পাকাইলাম। কিন্তু নুন বা মরিচ কিছুই সঙ্গে ছিল না। ইহা জানিতে পারিয়া ষ্টীমারের কর্মচারীরা আমাকে উহা দিতে চাহিলেন। আমি হুজুরকে জানাইলে হুজুর উহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। খাইতে বসিলাম, কিন্তু বর্তন, গ্লাস, থাল-বাটী কিছুই সঙ্গে ছিলনা শুধু একটী টিফিন কেরিয়ার সঙ্গে ছিল। হুজুর একটি পেয়ালায় ভাত লইলেন এবং আমাকে পেয়ালার ঢাকনীতে ভাত এবং সিদ্ধ ডিম নিজ হাতে পরিবেশন করিলেন। নুন এবং মরিচ ছাড়াই সেদিন খাওয়া হইল। পীর ছাহেব হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, আমার খুব অসুবিধা হইতেছে; তাই তিনি ইষৎ হাসিয়া বলিলেন—"একদিন নুন মরিচ ছাড়াই খাইয়া দেখে না কেমন লাগে!" নির্ব্বাক, নিরুত্তর থাকিয়া আমি স্বাভাবিক ভাবে গলাধঃকরণ করিয়া চলিলাম। হুজুর নিজে খাইতেছেন, আমাকে খাইতে বলিতেছেন, নুন মরিচের স্বাদ কি তখন মনেই ছিলনা। আল্লাহ্‌র ভয়েই তিনি সেদিন এরূপ করিয়াছিলেন।

মাদ্রাছার চাঁদার টাকা কিংবা অনুরূপ কোনও চাঁদার টাকা পীর ছাহেব হাতে লইতে রীতিমতো পরহেজ করিতেন। ইহা আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা। কচিৎ উহা হাতে লইয়া বসিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা নিকটবর্ত্তী জনের বা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে দিয়া নিস্কৃতি পাইতেন। মাদ্রাছার চাঁদা হাতে লওয়া কি গুণাহের কাজ? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু পীর ছাহেব কেবলার হৃদয়ে নিম্ন হাদাছের অনুরূপ

তাকওয়া বিরাজমান ছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতেন। হাদাছ শরীফে উল্লেখ আছে—

"মোত্তাকী ঐ ব্যক্তি, যে বহু জায়েজ কার্য্যকে আল্লাহ্‌র ভয়ে নাজায়েজ রূপে পরিত্যাগ করিবে।" একথা আমরা পীর ছাহেব কেবলার জীবনীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি বাটীস্থ মাদ্রাছাহ্ দালানের গায়ে হাত দিয়া তৈয়ম্মম পর্য্যন্ত করিতেন না। উহাতে তৈয়ম্মম করা কিছু মাত্র নাজায়েজ নহে, কিন্তু ইহা হইতে পরহেজ করা অতি উচ্চ শ্রেণীর তাক্ওয়ার আলামত।

পীর ছাহেব হামেশা ছুন্নত ও মোস্তাহাবের প্রতি নেঘাহ্ রাখিতেন; নফল নামাজ হামেশা পড়িতেন। তাঁহার তাহাজ্জুদ নামাজ কাজা হইতে দেখি নাই। তিনি গভীর রাত্রে জাগরিত হইতেন। অতি অল্প সময় নিদ্রা যাইতেন। শেষ রাত্রে জেক্‌র মোরাকাবা ও রোনাজারী করিতেন। কখনও বা দীর্ঘ সময় ব্যাপী মোনাজাত করিতেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

পরদা সম্বন্ধে তাকওয়া—নারী ও পুরুষের পরদা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র হুকুম তিনি কঠোর নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও বেগানা আওরতের সম্মুখে যান নাই কিংবা অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও কোন ভক্ত-মুরীদের স্ত্রী-কন্যারা দর্শন লাভ, দোওয়া গ্রহণ, অথবা কদমবুছি করিবার ঐকান্তিক আগ্রহ জানাইলেও তিনি তাহাদিগকে সম্মুখে

আসিবার এজাজত দান করেন নাই। মেয়ে মহলে অনেক স্থলে তিনি তওবা পড়াইয়াছেন। কিন্তু উহা সর্ব্বদাই রীতিমতো পরদার বাহির হইতে। তিনি এই উপলক্ষে কাহারো বারান্দায় উঠিলে তওবা পড়ানো এবং তৎসহ গুটি কয়েক মোটামুটী নছিহত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিত্যাগ করিতেন। হঠাৎ কোনও 'আজনবী' নারীর চেহারা তাঁহার সম্মুখে না পড়ে এই সম্পর্কে তিনি সব সময়ে সচেতন থাকিতেন। গ্রামাঞ্চলের ভিতর দিয়া পালকী যোগে মহা সমারোহে যখন তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইত তখনকার সেই কোলাহল, নারায়ে তকবীর ধ্বনীও জনস্রোত প্রভৃতি দেখিবার আগ্রহে, গ্রাম্য বঁধু, বালিকা, ও পৌঢ়া মেয়েরা পর্য্যন্ত বাড়ীর আঙ্গিনায়, উঠানে, ও আশে পাশে সকৌতুকে বাহির হইয়া আসিত। এরূপ দৃশ্যের অবতারণা হইলে হুজুরকে পালকীর দরজা বন্ধ করিয়া দিতে দেখিয়াছি এবং চক্ষু মুদিয়া পালকীর ভিতরেই মোরাকাবায় বসিয়া যাইতে দেখিয়াছি। বেগানা নারীর চেহারাকে তিনি এতাদৃশ ভয় করিতেন যে, ছোট ছোট বালিকাদিগকেও তিনি দেখা দিতেন না বা তাহাদের মুখের দিকে তাকাইতেন না। বহু স্থলে এরূপ দেখিয়াছি যে, হুজুরের মাহফিলের আশে পাশে আসিয়া ছোট ছোট বালিকারা ভীড় করিয়াছে। হুজুরের দৃষ্টি সেদিকে পড়িবামাত্র তিনি শঙ্কিত ভাবে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়াছেন এবং সগর্জ্জনে তৎক্ষণাৎ বালিকাদিগকে

সভাস্থল হইতে হটাইবার নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থানে রাগান্বিত হইয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"তোমরা এরূপ পাগলামী করিয়া সভায় বালিকাদের আমদানী করিলে আমি সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।"

কোন কোন স্থানে এরূপও দেখিয়াছি যে, সভাস্থল হইতে সন্নিহিত বাড়ীর বা বাসার গবাক্ষপথে মেয়েদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে কিংবা মেয়েদের আনাগোনা দৃষ্টিপথে পড়িয়া যাইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আবরু, পরদা কিংবা বেড়া দেওয়াইয়া ছাড়িয়াছেন। বেড়া না দেওয়া পর্য্যন্ত সভার কার্য্য আরম্ভ করেন নাই।

চলার পথে কোনও স্থানে বেগানা ও বেপর্দ্দা আওরতের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে হুজুর যে কিরূপ বিচলিত এবং উৎকণ্ঠিত হইতেন তাহা দেখিয়া সময়ে আমরা কৌতুক অনুভব করিতাম।

"মোমেনগণকে বল যে, তাহারা পর স্ত্রী হইতে যেন তাহাদের দৃষ্টি অবনত করে," এবং "তোমরা ব্যভিচারের ধার দিয়াও যাইও না"—আল্লাহ্‌র এই কঠোর নির্দ্দেশ পীর ছাহেবকে এরূপ ভীত করিয়াছিল যে, তিনি বেগানা নারীর দৃশ্য দৃষ্টি পথে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে যেন ছুটাছুটী করিয়া পালাইতে চাহিতেন এবং নিরাপদ দূরত্বে আশ্রয় লইতেন।

একবার ফুরফুরা হইতে দেশে ফিরিবার পথে আমরা পীর ছাহেব সহ সদলবলে ট্রেনের একটি তৃতীয় কি মধ্যম শ্রেণীর

কামরায় উঠিয়াছি। বরিশাল এক্সপ্রেস। স্বভাবতঃই দারুণ ভীড়। গাড়ীর কামরায় বহু হিন্দু নারী তাহাদের স্বাভাবিক বেশ ভূষায় হেলিয়া দুলিয়া ভীড় ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িল। পীর ছাহেব এই দৃশ্য দেখিয়া এরূপ ঘাবড়াইয়া গেলেন যেন তাহার লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যের সম্পত্তি চুরি হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি ট্রেনের কামরা হইতে নীচে নামিয়া পড়িলেন এবং ষ্টেশনে বসিয়া গেলেন। সেই গাড়ীতে পীর ছাহেবের যাওয়াই হইল না। পরে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পীর ছাহেব বলিলেন—"জান, আমি টিকেটের এই টাকাগুলি কেন ব্যয় করিলাম? উহা আমি আমার নজরের ছদকা দিলাম।" এই কথার তাৎপর্য্য হয়তো ইহাই ছিল যে, হারাম দৃষ্টি হইতে চক্ষুকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে আপার ক্লাশের টিকেটের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল, বিলাসতার জন্য নয়।

ছফর উপলক্ষে এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। ট্রেনের টিকেট করিয়া কামারায় উঠিয়া মেয়েলোক থাকার কারণে কামরা বদল করিতে হইয়াছে।

নিজ বাড়ীতেও এইরূপ কঠোর পরদার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন যে, যাহারা চিরদিন পীর ছাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছেন তাহারাও কেহ পীর ছাহেবের বা পরিবারভুক্ত অন্য কোনও শিশু বালিকাকেও দেখিতে পারেন নাই। এমনকি মেয়ে পুরুষের পার্থক্যবোধ যে বালকের

মধ্যে জন্মিয়াছে, তেমন কোন বেগানা বালককে বাড়ীর অভ্যন্তরে জানানা মহলে প্রবেশের অনুমতি দেন নাই কারণ, ঐরূপ ব্যবস্থাই শরীয়তের নির্দ্দেশ।

কিশোর বালকদের সম্পর্কেও তিনি সাবধান ছিলেন। কিশোরদের নমণীয় কচি চেহারা নারী মুখের তুল্য, উহাতে স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে। পীর ছাহেব জড় দেহের এই বাস্তব চেতনা সম্পর্কে দস্তুরমত হুশিয়ার ছিলেন। গুণাহে পতিত হইবার ভয়ে তিনি এখানেও পরহেজ করিতেন। ভণ্ড সাধু ফকিরের ন্যায় তিনি কাম, মোহ, ইত্যাদি জৈবিক দেহের দাবী সম্পর্কে মিথ্যা ভাড়ামী করিতেন না। বরং শরীয়তের নির্দ্দেশগুলিকে চুল চেরা করিয়া প্রতিপালন করিতেন এবং গুণাহে পতনের আশঙ্কা ও শয়তানের ওছওয়াছাহ হইতে সর্ব্বদা ডড়াইতেন। দাড়ী, গুম্ফহীন কিশোর বালকেরা পীর ছাহেবের দরবারে আসিত, দোয়া গ্রহণ করিত, কদমবুছি করিত; বাছ, তারপরই বিদায়! জলদি জলদি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিতেন। তাহাদের কাহাকেও সঙ্গী করিতেন না, বা তাহাদের হাতে কোন খেদমত গ্রহণ করিতেন না।

তাওয়াক্কোল

আল্লাহ্‌র ওলী এবং রছুলুল্লাহ্‌র প্রকৃত প্রতিনিধিগণ ইমানের উচ্চস্তরে উন্নীত থাকেন। কাজেই তাঁহাদের চরিত্রে ইমানের ছেফাতগুলি বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। সাধারণ মানুষের পক্ষে উহা অনুকরণযোগ্য এবং আদর্শ স্থানীয়। তাওয়াক্কোল অর্থ আল্লাহের শক্তির উপর নির্ভরতা। আল্লাহর উপর যাহার ঈমান যতো প্রগাঢ়, তাহার তাওয়াক্কোল ততো অধিক। হজরত পীর ছাহেব কেবলার তাওয়াক্কোল পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। মাদ্রাছাহ্, ফ্রি বোর্ডিং, নিজ মোছাফেরখানা এবং পরিবার পরিজন ইত্যাদি বাবদ মাসিক আনুমানিক ব্যায় দশ হাজার টাকার কম ছিল না। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর নিজ বাড়ীতে দুইটি ইছালে ছওয়াব মাহফিলের ব্যয় ছিল কম পক্ষে পচিশ হাজার টাকা। তাঁহার দায়ীত্বে এই বিরাট অঙ্কের নিয়মিত ব্যয় থাকা সত্বেও তাঁহাকে ক্ষণিকের তরে এইজন্য উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত দেখি নাই। পক্ষান্তরে মাসিক দুই শত টাকা আয় হইতে পারে এমন কোনো জায়দাদ পীর ছাহেবের ছিল না। শুধু আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কোল করা ছাড়া এই বিপুল ব্যয়ের কোন অবলম্বনই তাঁহার ছিল না। অথচ তিনি ছিলেন নির্ব্বিকার, প্রশান্ত, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। তিনি সর্ব্বদা নিজ কর্ত্তব্যে এবাদতে জেকরে মোরাকাবায়, তা'লীমে ও হেদায়েতে নিবিষ্ট থাকিতেন। কোথা হইতে দৈনন্দিন এই বিরাট খরচের টাকা আসিবে

সেজন্য তিনি তিলমাত্র ভাবনা করিতেন না। হুজুর প্রায়ই বলিতেন যে, "এই যা' কিছু দেখিতেছ, ইহা চালাইবার ক্ষমতা নেছারুদ্দীনের নাই। যে মা'বুদের ইচ্ছায় ইহা ঘটিয়াছে আমি সবই তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছি; সেই মা'বুদই ইহা চালাইবেন, তিনিই ইহার ছামান জোগাড় করিবেন। তিনি অধিকাংশ সময় কোরাণ শরীফের নিম্ন আয়াত ঃ—

ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها

অর্থাৎ "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোনও জীব নাই যাহার রেজকের ভার আল্লাহ্‌র উপরে নাই।" সুতরাং তোমরা কেন ভাবিতেছ? তোমরা কোনও নেক কার্য্যের অছিলা গ্রহণ কর, উহার ভিতর দিয়াই আল্লাহ্ তোমাদের রেজক পৌঁছাইবেন। বস্তুতঃ আমরা প্রত্যহই ইহা স্বচক্ষে হুজুরের দরবারে দেখিয়াছি। হুজুর নিবিষ্ট মনে নির্ভাবনায় নিজ কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। ক্ষণিকের তরেও বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন হন নাই। আল্লাহ্ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে রেজক প্রেরণ করিয়াছেন। আবার অকাতরে তিনি উহা নেক কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। সামান্য সন্দেহ এবং শরীয়তের ছোট-খাট ত্রুটির জন্য তিনি শুধু শত শত নহে, সহস্র সহস্র টাকা এবং অন্যবিধ হাদীয়া ফেরৎ দিয়াছেন—এবং বলিয়াছেন 'রেজকের জন্য আমি একমাত্র মাবুদের উপর তাওয়াক্কোল করিয়াছি; তোমাদের পরওয়া করি না।" কাহারো নামাজ কামাই যাওয়ার জন্য, কাহারে দাড়ি মুণ্ডনের জন্য, কাহারো বা ঘুষ সুদ ও

জমা জমির অবৈধ দলীল ও অবৈধ পেশার জন্য হাদীয়া নজরানা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আবার উঁহা, মাসেক দুইমাস কখনও ছয়মাস কি এক বছর পরে ঘুরিয়া হুজুরের হাতে আসিয়াছে। সেই আগন্তুকরা সকাতরে সবিনয়ে আবেদন জানাইয়াছে—"হুজুর আমি আর তারপর নামাজ কাজা করি নাই, দাড়ি রাখিয়াছি, ঘুষ ছাড়িয়াছি, পর্দ্দা করিয়াছি, মাথার লম্বা চুল কাটিয়াছি আপনার হাদীয়া আজ কবুল করুন!" এরূপ অবস্থায় হুজুর যে কত উৎফুল্ল, কত খুশী হইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি তখন সববেত সকলকে লইয়া ঐ সকল লোকের জন্য দো'ওয়া করিয়াছেন এবং এই মর্ম্মে এরশাদ করিয়াছেন যে,—"দেখ, আমি যদি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কোল না করিয়া লালচ করিতাম তাহা হইলে এই লোকগুলি কি করিয়া হেদায়াত পাইত!" আরও বলিতেন যে,—আলেমদের ভিতর তাছাওয়াফ না থাকার কারণে তাহারা রুজী রোজগার সম্বন্ধে মানুষের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে এবং এইভাবে গোমরাহী ছড়াইয়া পড়িতেছে।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জায়েজ পেশা সমূহের বিরোধী ছিলেন না বরং, ব্যবসায়, বাণিজ্য হালাল চাকুরি ও কৃষি ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার বৈধ পেশায় উৎসাহ দিতেন।

তাওয়াক্কোলের পরীক্ষা এবং পুরষ্কার দুই-ই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে পীর ছাহেবের ভাগ্যে মিলিয়াছিল। প্রথম জীবনে তিনি বহু সময় রিক্ত হস্ত হইয়াছেন, হাতে কপর্দ্দকও

রহে নাই। ঘরে চাউল, পকেটে বাজার খরচের পয়সা, কিছুই রহে নাই, শুধু রহিয়াছে তাঁহার একনিষ্ঠ তাওয়াক্কোল, রহিয়াছে প্রশান্ত উজ্জ্বল চেহারা, রহিয়াছে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস আর তাহার রহমতের উপরে অকুণ্ঠ নির্ভরতা। সুতরাং সাময়িক অসুবিধায় পড়িলেও তিনি হাসি মুখে ছবর করিয়াছেন এবং তার বিনিময়ে আসিয়াছে খোদার রহমত, অজানিত অভাবিত পথে অজস্র ধারায় সেই রহমত আসিয়া তাঁহাকে প্রাচুর্য্যের প্লাবনে ভরিয়া দিয়াছে।

একদিনের একটি ঘটনা শুনিয়াছি।

বাড়ীতে বহু অতিথি মেহমান বর্ত্তমান; অথচ ঘরে চাউল নাই। কিনিবার সঙ্গতিও সম্ভবত: ছিল না। এইরূপ অবস্থায় ঘরের লোকেরা যখন চিন্তিত ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি আং মণ পরিমাণ চাউল লইয়া উপস্থিত।

যাই হোক। এরূপ ঘটনা বহু রহিয়াছে। হাতের টাকা নিঃশেষ হইলে কাজ চালাইবার জন্য তিনি কখনও ধার কর্জ্জও করিয়াছেন। টাকা হাতে আসিলেই আবার উহা পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। ধার কর্জ্জ করা তাওয়াক্কোলের পরিপন্থী নহে। রছুলুল্লাহ (দঃ) ও স্বয়ং ধার কর্জ্জ করিয়াছেন, এমন কি জিনিষ বন্ধক রাখিয়াও কর্জ্জ করিয়াছেন।

পরবর্ত্তীকালে হুজুরের জীবনে অর্থের প্রাচুর্য্য আসিয়াছিল। তিনি হাজার হাজার টাকার দুর্মূল্য কেতাব সমূহ খরিদ করিয়া বিরাট এক কুতুবখানা সৃষ্টি করিয়াছেন। হেদায়েতের জন্য

ছফর উদ্দেশ্যে বিরাট বজরা খরিদ করিয়াছেন। বার্ষিক ইছালে ছওয়াব মহাফিলের জন্য হাজার হাজার টাকার সামিয়ানা ডেকচি কড়াই ইত্যাদি আছবাব খরিদ করিয়াছেন। কিন্তু উৎপাদনমূলক কোন কাজে টাকা খাটান নাই অথবা ভবিষ্যতের ভয় করিয়া জমিন জায়েদাদ খরিদ করেন নাই। সকল টাকা জীবন ভরিয়া বিভিন্ন নেক কার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি খোদার দরবারে একটি 'ফকির' হিসাবেই চলিয়া গিয়াছেন, মালদার হিসাবে নহে। সমগ্র জীবন ভরিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ তাওয়াক্কোলের প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন জীবনের প্রতি কাজে ও কথায়।

ছবর, শোকর, রেজা ও তছলীম

"আমি ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, ধন-সম্পত্তি, জীবন এবং ফল-ফসলের বিনাশ দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং ধৈর্য্যশীল বান্দাদিগকে সুসংবাদ দাও যাহারা মছিবতের সময় বলে—'নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইব।' ইহা আল্লাহ তায়ালার ফরমান। আল্লাহ তায়ালা মোমেন বান্দাগণকে নানাবিধ মছিবতের ভিতর দিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন ধৈর্য্যের পরীক্ষা, সহিষ্ণুতার পরীক্ষা। ইহার পরিণাম মোমেনদের মর্য্যদা বৃদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ।

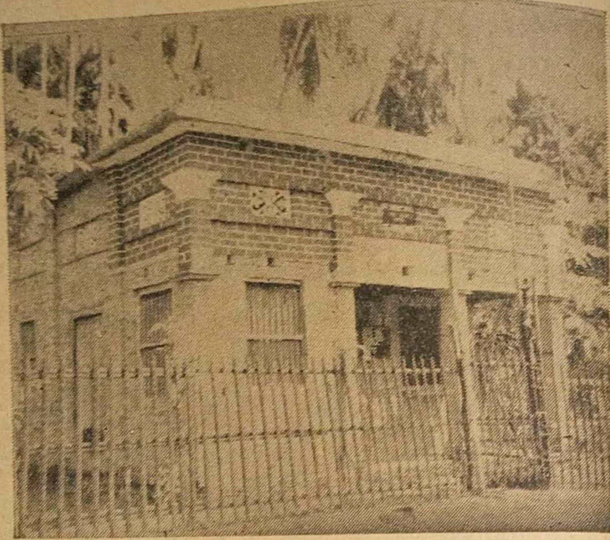
হজরত পীর ছাহেব কেবলাকে আমরা অসাধারণ ধৈর্য্যশীল দেখিয়াছি। সব ব্যাপারেই। তীব্র ক্ষুধায় মানুষ মাত্রেই বিচলিত হয়। পীর ছাহেবকে সেরূপ বিচলিত হইতে কখনও দেখি নাই। অবশ্য অভাবে মানুষ ছবর করে কিন্তু সেতো দায়ে ঠেকিয়া। হুজুরকে সেরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখি নাই, তবে তীব্র ক্ষুধার দাহনে তাঁহার চেহারা ঝলসাইয়া যাইতে দেখিয়াছি কিন্তু কাহাকেও বলেন নাই তিনি অভুক্ত রহিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াই তিনি ক্ষুধা সহ্য করিয়াছেন। খাইবার নিয়মিত সময় বহুদিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কখনও নিজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারেন নাই কখনও বা খাদেমগণ সময়মত খানা হাজীর করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেজন্য কোনওদিন কাহারও প্রতি নাখোশ হইয়া কটু বাক্য বলিয়াছেন বা অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছেন, একথা কেহ বলিতে পারেন না। কোনও ওয়াক্তে খাইতে একান্ত অসময় হইয়া গেলে সে ওয়াক্তে আর খাইতেন না। ইহাই হুজুরের সাধারণ নিয়ম ছিল। এমন অনেক দিন ঘটিয়াছে। সে ওয়াক্তের মতো তিনি শুধু সামান্য কিছু নাস্তাপানি খাইয়া কাটাইয়া দিয়াছেন কিন্তু কোন অস্থিরতা বা অধৈর্য্য প্রকাশ করেন নাই। কোনও বাবুর্চিই নিত্য রুচী সম্মত করিয়া পাকাইতে পারে না এজন্য সকল বাবুর্চিকেই কম বেশী জওয়াবদিহী করিতে হয়; কিন্তু খানা ভালো হয় নাই বলিয়া কোন বাবুর্চিকে

পীর ছাহেবের নিকট জীবনে একদিনও কৈফিয়ত দিতে হয় নাই। কৈফিয়ত কেন? মজার জন্য। কিন্তু মজাকেতো হুজুর রীতিমতো ভয় করিতেন। প্রবৃত্তির লালচে মজাকে ভয় করা এবং উহা হইতে পরহেজ করাইতো ওলা লোকের ছেফত। কাজেই সে দিক দিয়া বাবুর্চিদের বড়ো আছান ছিল। হাঁ, তবে কখনও তরকারিতে তৈল ভাসলে কিংবা ঘি অনুভব যোগ্য হইলে অথবা কোন জিনিষ অনাবশ্যক অতিরিক্ত ব্যয় হইলে উহার কৈফিয়ত নিশ্চয়ই দিতে হইত।

খাদ্যে হুজুরের মাঝে মাঝে অরুচী লক্ষ্য করিয়াছি। ছফরে অনবরত ও অনিয়মিত পরিশ্রমে বহু সময়ে খানা খাওয়ায় অরুচী ধরিয়াছে। খাইতে বসিয়া ভাত খাইতে পারেন নাই দুই চার লোকমা খাইবার পরেই অবশিষ্ট খাদ্য ফিরাইয়া দিয়াছেন। কখনও বা এক আধটা কাচা মরিচ চাহিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এটা পাকাও, সেটা পাকাও, খাইতে পারিতেছিনা, ইত্যাদি বলিতে কোনও দিনই শুনি নাই।

বিপদ আপদ, ভয়-ভীতি, নিন্দা কুৎসা, ও হিংসা-বিদ্বেষ পীর ছাহেব কেবলার জীবনের উপর প্রচুরই ছিল। কিন্তু তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তিনি ছবর ও সহিষ্ণুতার এক বিরাট আদর্শ ছিলেন।

তিনি যখন দেশে প্রথম হেদায়েত আরম্ভ করেন এবং তাছাওয়াফ তালীম দিতে শুরু করেন তখন কয়েকটি সম্প্রদায়ের লোক হুজুরের প্রতি বড়ো বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা তাহাদের একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ হওয়ায় এবং প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষতি সাধনের বৃথা আশঙ্কায় তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন বিদ্বেষ মূলক প্রচার এমনকি সভা সামিতিতে ও বই পুস্তকে অভদ্র ও অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। পীর ছাহেব উহাতে উত্তেজিত হন নাই, নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করেন নাই। তিনি সমবেত জনতাকে লইয়া সেই মুহূর্ত্তে প্রকাশ্য সভায় তাহাদের আচরণ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিজ মুখে ক্ষমার কথা উচ্চারণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেহ তাঁহার কুৎসা করিলে উহা শুনিয়া তিনি বড় আনন্দিত হইতেন এবং বলিতেন—"আমার নিন্দাকারীকে জানাইয়া দিও যে, তিনি আমার দোস্ত। কারণ তাঁহার নেকী সমূহ তিনি আমাকে দান করিয়াছেন। এমন কাজ যিনি করেন তাহার প্রতি নাখোশ হইতে নাই" ইত্যাদি। কিন্তু মত, পথ, এতেকাদ ও মছলা বিষয়ক হইলে তিনি প্রতিবাদ করিতেন। প্রয়োজন বোধে বিজ্ঞাপন, ইস্তেহার ও বই পুস্তক প্রকাশ করিতেন কিন্তু, উহাতে কটুবাক্য, বা ঝাঁঝাল কথা থাকিত না। বিদ্রূপাত্মক, বিষাক্ত ও বেদনা দায়ক কথা আদৌ লেখা



মরহুম পীর ছাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দারুচ্ছুন্নাহ্‌র নিজস্ব ডাকঘর



হইত না। পীর ছাহেব নিজে কিছু লিখিতেন না। দরবারস্থ লেখকেরা পীর ছাহেবের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেন। সময়ে লেখকেরা পীর ছাহেবের প্রতি অত্যধিক মমতায় কঠিন প্রতিবাদ করিতে চাহিতেন, কখনও রূঢ় কথা লিখিয়া ফেলিতেন, কিংবা তীক্ষ্ম মন্তব্য করিয়া বসিতেন কিন্তু পীর ছাহেব উহা কিছুতেই মানিয়া লইতেন না। সেগুলি কাটাইয়া সংশোধন করিয়া, সুরুচীপুর্ণ মধুর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করাইয়া ছাড়িতেন। বলিতেন—"বাবা, হেদায়াত শিখ, কড়া কথায় হেদায়াত হয় না, উহাতে হেদায়াত নষ্ট হয়। তোমাদের কলমকে মাঝে মাঝে মধু খাওয়াও"। ইহাতে আমরা বিরত থাকিতে বাধ্য হইতাম।

"মাওলানার উক্তি খণ্ডন" এবং "রদ্দে বদগুমান" নামক দুই খানা পুস্তক প্রণয়ন করা হয়, বিদ্বেষ নিন্দা ও কুৎসা মূলক দুই খানা পুস্তকের প্রতিবাদে। উহাতে কেবল প্রতিপক্ষের আক্রমণের অযৌক্তিকতা এবং আলোচ্য বিষয়ে কেতাবী প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কটুকে কটু দ্বারা প্রতিবাদ করেন নাই।

হুজুরের সর্ব্ব প্রথম সন্তানটীর নাম ছিল আবদুল মান্নান। ছেলেটীর তারিফ হুজুরের নিজ মুখে শুনিয়াছি। ছেলেটী বড়ো সুদর্শন ছিল, যে দেখিত সেই একবার কোলে লইত। এই সন্তানটী অল্প বয়সে মারা যায়। যেদিন সন্তানটী মারা গেল সেইদিন রাত্রে খানা খাইবার জন্য হুজুরের জনৈক নিকটআত্মীয়

সাধিতে ও সান্তনা দিতে আসিলেন। তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন যে, এত বড় মুছিবতের দিনে পুত্র শোকাতুরকে কি সাধ্য সাধন ছাড়া খানা খাওয়ানো যাইবে? কিন্তু হুজুর তোষামুদি শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"বলেন কি! আজ আমি নিত্যকার চেয়ে বেশী ভাত খাইব। তাহা না হইলে আল্লাহর কাজায় রাজী থাকিলাম কেমন করিয়া?"

এত বড় পুত্র শোককে তিনি যে এরূপ বরদাশত করিতে পারিবেন ইহা কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই। হুজুর সেই সন্তান বিয়োগে এক ফোটা অশ্রুও বিসর্জ্জন করেন নাই এবং ছেলের আম্মা ছাহেবানীকেও করিতে দেন নাই। ইহা হুজুরের প্রথম যৌবনের ঘটনা। ইহা আমরা হুজুরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি। আর স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি উহার দুই একটী ঘটনা বলিতেছি:—

আমরা তখন হুজুরের সঙ্গে ছফরে। বাড়ী হইতে ৮।১০ মাইলের মধ্যে কড়াপুর নামক গ্রামে একটি বিরাট ওয়াজের মাহফিলের আয়োজন হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে বেশুমার লোক দলে দলে সভায় আসিতেছিল। সভা তখনও শুরু হয় নাই। হুজুর জোহরের নামাজের ওজুর জন্য বাহির হইয়াছিলেন। এই সময় হুজুরের একটি বিবাহিতা কন্যার মৃত্যু সংবাদ সহ টেলিগ্রাম আসিল। এহেন সময় এই মর্ম্মান্তিক শোক সংবাদ কেহই হুজুরের নিকট ব্যক্ত করিবার সাহস পাইতে ছিলেন না। অগত্যা আমাকে

এই নিদারুণ সংবাদ হুজুরের গোচরীভূত করিতে হইল। সংবাদ শুনিয়া হুজুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া স্থির রহিলেন। তারপর তিনি ওজু করিয়া জামাতে নামাজ আদায় করিলেন এবং পরে ওয়াজ শুরু করিলেন। কিছুক্ষণ ওয়াজ নছিহত করিবার পর সভায় ঘটনাটি জানাইয়া সেই কৈফিয়তে সভাস্থ সকলের নিকট তিনি বিদায় চাহিলেন। একটু পরে সভা ভঙ্গ হইল। আমরা সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রেই লাশ হুজুরের বাড়ীতে পৌঁছিল। দাফন ও কাফন ইত্যাদি সব কিছু সমাধান হইল। দুই একদিন পরেই হুজুর আবার ছফরে বাহির হইয়া গেলেন; কিন্তু, সন্তান বিয়োগ জনিত কোনও প্রকার হা-হুতাশ, আহাজারী কিছুই করিতে দেখি নাই।

সন্তান বিয়োগের আরও একটি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আমাদের সম্মুখেই ঘটিয়াছিল। হুজুরের ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠ এবং কন্যাদের একজনের বড়ো ছিলেন হজরত শাহ মোহম্মদ নূর ছাহেব। একুশ কি বাইশ বছরের তরুণ যুবক। তিনি অনুপম দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী ছিলেন। দেহের গঠনে, মুখের প্রতিচ্ছায়ায়, চরিত্রে এবং দৃঢ়তায় তিনি হুজুরের প্রতিচ্ছবি ছিলেন বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেন। তিনি বাড়ীর মাদ্রাছায় টাইটেল ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি হুজুরের সঙ্গে হজ্জ সমাপন করিয়াছিলেন। হুজুর তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই সর্ব্বাধিক স্নেহ পোষণ করিতেন। দুরন্ত বসন্তরোগে তিনি আক্রান্ত হন এবং কয়েক দিনের

মধ্যেই এন্তেকাল করেন। হুজুর তখন অসুস্থ এবং অত্যধিক দুর্ব্বল। তিনিও অন্তিম রোগে ভুগিতেছেন। শাহ্ মোহম্মদ নূর ছাহেব যখন মুমূর্ষ তখন হুজুরকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া সকলে ধরাধরি করিয়া রোগীর কামরায় নেওয়া হইল; কারণ, হুজুরের হাটিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। চেয়ারে বসাইয়া হুজুরকে যখন মুমূর্ষ ছোট শাহ্ ছাহেবের কামরায় নেওয়া হইতেছিল আমরা তখন একটি ঘনায়মান কেয়ামতের অপেক্ষা করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, হুজুরের এই দুর্ব্বল দেহ, তদুপরি এ হেন প্রাণ তুল্য পুত্রের বিয়োগ ঘটিলে এবার না জানি হুজুরের অবস্থা কি হয়! ভয়ে আশঙ্কায় আমাদের সকলের প্রাণ দুরু দুরু করিতেছিল। মাওলানা শাহ্ মোহম্মদ নূর ছাহেব এন্তেকাল করিলেন। হুজুর নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন। উপস্থিত সকলেরই বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কান্নার রোল উত্থিত হইল, কিন্তু, হুজুর নীরব, নিস্তব্ধ! এন্তেকালের মিনিট কয়েক পরেই হুজুরকে আবার নিজ জায়গায় আনা হইল। তাঁহাকে যখন সেখান হইতে ফিরাইয়া আনা হইতেছিল তখন হুজুরকে পূর্ব্বাপেক্ষা নিরুদ্বিগ্ন ও হাল্কা বোধ হইতেছিল। এত বড় হৃদয় বিদারক ঘটনায়ও একটিবার উহ্ আহ্ কিংবা পুত্র বিয়োগ জনিত কাতর শব্দ প্রকাশ পায় নাই। আল্লাহর ইচ্ছার উপরে রাজী থাকার ক্ষমতা এবং 'ছবর' কতো পরিমাণ থাকিলে এরূপ মর্ম্মান্তিক শোক নীরবে সহ্য করা যায় তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

শেষ বেলার দিকে হজরত শাহ্ মোহম্মদ নূর ছাহেবের এন্তেকাল হইয়াছিল। রাত্রিবেলা আম্মা ছাহেবানীরা সবাই প্রাণ তুল্য পুত্রের জানাজা দেখিতে হুজুরের কুতুব খানায় আসিয়াছিলেন। হুজুর অতি মৃদু শব্দে তাঁহাদিগকে সান্তনা দিতেছিলেন—"তোমরা সবাই ছবর কর, নূর আমাদের নিকট আল্লাহর আমানত ছিল; আল্লাহ্ আবার আমাদের নিকট হইতে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়াছেন। আমরা তাঁহার যে খেদমত করিয়াছি সেজন্য আমরা খোদার নিকট হইতে ছওয়াব পাইব।" কথাগুলি অবিকল এই-ই ছিল কিনা, ইহাতে আমার একটু সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে কারণ, আমরা তখন ঘরের বাহিরে একটু দূরে থাকিয়া পরোক্ষ ভাবে শুনিয়াছিলাম। তবে কথাগুলির মোটামুটি মর্ম্মার্থ উহাই ছিল।

তবে মানব হৃদয় পাষাণে গড়া নয়। তাই পীর ছাহেবকে অতি মানবীয় চরিত্রে মানবের নাগালের বাহিরে কল্পনা করাও ঠিক হইবে না। সেইজন্য ক্ষণিকে আবার সাধারণ মানুষের চরিত্র তাঁহার ভিতরে প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি। এই শাহ্ মোহম্মদ নূরের জানাজার সময় হুজুরের বড় ছাহেবজাদা শাহ্ মোহম্মদ নূরের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থী হইলেন এবং তাঁহার প্রতি কাহারও কোন দাবী থাকিলে তাহা মাফ চাহিলেন। সেই মুহূর্ত্তে হুজুর একটু জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"মোহম্মদ নূরের সঙ্গে যাহারা চুক্তি রাখে কেয়ামতে

তাহারা তাহার পুরস্কার পাইবে। মোহম্মদ নূর আল্লাহ্‌র ওলী ছিল।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া গিয়াছিল এবং একটু কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে কান্না আমরা শুনিয়াছিলাম কিন্তু তা' ঐ একবার মাত্র; আর নহে। এই ঘটনার পর হুজুর আর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না; কিন্তু, যতদিন জীবিত ছিলেন মরহুম শাহ্‌ মোহম্মদ নূর সম্পর্কে হুজুরের মুখে কোনও আক্ষেপ ও আলোচনা শুনিতে পাই নাই।

হুজুরের জীবনে আর একটি কঠিন বিপদের কথা উল্লেখ যোগ্য। ঘটনাটি হুজুরের জীবনের শেষ প্রান্তে ঘটিয়াছিল। পীর ছাহেব কেবলা ছফর হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বরিশালের বিষখালী নদী বিখ্যাত। এই নদীতে পান্‌সী নৌকাযোগে তিনি বাড়ীর পথে চলিয়াছেন। কোনও কারণ বশতঃ বজরা পৃথক হইয়া গিয়াছিল। হুজুরের প্রধান সহচর মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেব হুজুরের সঙ্গেই ছিলেন। একখানি মোটর লঞ্চ নৌকা টানিয়া লইতেছিল। হঠাৎ প্রবল ঝড়ে নদীর পানি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ঝড়ের মুখে ক্ষুদ্র লঞ্চ বেগ সামলাইতে না পারিয়া নৌকার রশি কাটিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিল কিন্তু প্রবল তুফানে হুজুর ও মাষ্টার এমদাদ আলী সহ নৌকাটি একেবারে উলটাইয়া গেল। হুজুর নৌকার পিছনের কামরায় বসিয়াছিলেন। সেই বদ্ধ কামরার ভিতর হইতে তিনি নৌকার ক্ষুদ্র জানালা দিয়া

কিভাবে বাহিরে আসিয়াছিলেন তাহা আজিও আমাদের সকলের নিকট বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। মাষ্টার ছাহেব নৌকার সম্মুখ ভাগে ছিলেন সুতরাং তাহার পক্ষে বাহির হওয়া কিছুটা সহজ ব্যাপার ছিল

যাহা হউক! উভয়েই এবার উপুর হওয়া নৌকার পেট ধরিয়া ভাসিয়া ঢেউয়ের সহিত উঠা নামা করিতেছিলেন। সেই সময়ের বিবরণ জনাব মাষ্টার ছাহেবের নিজ মুখে শুনিয়াছি যে, সেই বিপদের মধ্যে হুজুর একান্ত ধীর এবং স্থির ছিলেন। একটু উৎকণ্ঠা বা ত্রাসের কোনও চিহ্নই হুজুরের চেহারায় পরিলক্ষিত হয় নাই। বরং তিনি মাষ্টার ছাহেবকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—"ঘাবড়াইওনা! পানিতেও খোদা বিরাজমান।"

উক্ত বিপদ হইতে তাঁহারা সকলেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। এমনকি, মাল আছবাব ও নৌকা ইত্যাদি সবই খোদার রহমতে রক্ষা পাইয়াছিল। সেই বিপদের দিনের একটি কথা হুজুর নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে, জীবন মরণের সেই যুগ সন্ধিক্ষণেও হুজুরের নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসের জেকের (পাছ আনফাছ) চলিতে ছিল। নৌকা ডুবির কালেও তিনি উহা বিস্মৃত হন নাই।

হুজুরের ধৈর্য্য সব সময়েই আমাদিগকে বিস্মিত করিত। আমরা ভাবিতাম, হুজুর মানুষের এত জ্বালাতন সহ্য করেন কি করিয়া? দিন নাই, রাত নাই, সময় অসময় নাই শুধু জনতা আর জনতার ভীড়! ক্ষণিকের জন্যও তিনি নিরিবিলি বিশ্রাম পাইতেন না। যদি বা একটু বিশ্রামের সময় জুটিয়াছে অমনি

কোথা হইতে আবার এক ঝাঁক লোক আসিয়া ভীড় করিয়া বসিয়াছে। তাহাদের সহিত সাক্ষাত না করিয়া, দেখা না দিয়া, কথা না বলিয়া হুজুর কখন বিশ্রামাগারে থাকিতেন না। যে অবস্থাতেই তিনি থাকিতেন, শোওয়া অথবা বসা, নবাগতের সংবাদ পাইলেই তিনি বলিতেন—ডাকো, আসতে বল!" সেই রাত দুপুরে, বারোটা একটায় সাক্ষাৎ প্রার্থীকে তিনি সাক্ষাৎ দান করিয়াছেন এবং পরম ধৈর্য্যের সহিত তাহার কথা শুনিয়াছেন। সারাদিন কর্ম্ম ক্লান্তির পরে মানুষের দেহ একটু বিশ্রাম চাহে, সেই বিশ্রাম যদি কেহ হরণ করে, যদি কেহ ব্যঘাত ঘটায়, তবে তাহার উপর বিরক্তি না আসিয়া পারেনা। নিজের সন্তানও এসময় পিতার নিকট তাড়া খায়, ধমক খায়। কিন্তু আল্লাহর ওলী যে, প্রিয় যে, তাঁহার চরিত্র যে কত অসীম উদার, তাঁহার ধৈর্য্য যে সীমাহীন আকাশের দূরত্ব ভেদ করিয়া কোন অসীমে উঠিতে পারে তাহা চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না! আমরা লোক দিগকে কত অনুরোধ করিয়া বারণ করিতাম, কত করিয়া বুঝাইতাম, সময়ে আড়ালে ফেলিয়া ধমকাইয়াও দিতাম, কিন্তু হুজুর তাহা জানিতে পারিলে আমাদিগকেই উলটা ধমক খাইতে হইত। কাজেই ওকাজটা আমরা চুপে চুপে করিতাম। কিন্তু প্রয়োজনের তাকিদ কোন আইন, কোনো ধমক মানে না। দর্শন প্রার্থীদের নিকট অনুরোধ উপরোধ যাহা কিছু করিতামনা কেন, তাহারাও অনেক কাকুতি মিনতি ওজর আপত্তি পেশ করিয়া হুজুরের কাছে যাইয়া হাজির হইত। হুজুর শোওয়া থাকিলে উঠিয়া

বসিতেন, আগন্তুকের হাল পুরছি করিতেন, খাওয়া দাওয়া হইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। খাওয়া না হইয়া থাকিলে বাবুর্চিকে তখনই ডাকিয়া খাবার দিতে বলিতেন। আমরা হয়ত তখন বিশ্রাম করিতেছি বা কোথাও বসিয়া কথাবার্ত্তার মশগুল হইয়াছি। হুজুর নিজের বিশ্রাম ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ প্রার্থীর নানা কথা শুনিতেছেন, জওয়াব দিতেছেন, কিংবা তওবা পড়াইতেছেন। এমনি করিয়া নিজ বিশ্রাম কালের আংশিক বা পূর্ণ সময় কাটাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে বিরক্ত হন নাই, রাগান্বিত হন নাই, বা সাক্ষাৎ পরে হইবে বলিয়া কাহাকেও ফিরাইয়া দেন নাই। এই কথাগুলি সামান্য মনে হইতে পারে কিন্তু ইহা করিতে যে অগাধ সহনশীলতার প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পীর ছাহেব কেবলা দীর্ঘ সময় ধরিয়া মোরাকাবায় বসিয়া থাকিতেন। তিনি নামাজের বৈঠকের ন্যায় হাটু ভাঙ্গিয়াই বসিতেন। অসহ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও আসন পাতিয়া বসেন নাই বা একান্ত অপারগ না হইলে তাকিয়া ঠেশ দেন নাই। নিজ মোরাকাবা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরেও আবার সেই বসা! চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত দর্শন প্রার্থী, ছবক প্রার্থী ও দরবারের অন্যান্য কর্ম্মীগণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া আবার সেই বসা। কুরছিতে নয় তখতে নয়, মাটীতে একই আসনে, আসন গড়িয়া। পাও বিস্তার করিয়া তিনি সাধারণতঃ বসিতেন না। লোক জনের ভিতরে পাও বিস্তার করিয়া কোন দিনই বসিতেন না। কখনও পাও গুটাইয়া বসিতে অসমর্থ হইলে সম্মুখের দিকে যদি একটু পাও মেলিয়া

দিতেন, তখনই হয়তো কেহ আসিয়া পায়ের প্রান্তে বসিয়া পড়িত। অমনি তড়িৎবেগে পাও টানিয়া লইতেন যেন জলন্ত অঙ্গার তাহার পদতল স্পর্শ করিয়াছে। মানুষের দিকে অবজ্ঞাভরে পাও বিস্তার করিয়া বসাকে তিনি আগুনের ন্যায় ভয় করিতেন। কখনও বলিতেন, 'ওঠ' পায়ের কাছে যাওইনা, আমাকে ফেরাউন বানাইও না। চরম ক্লান্তির সময়েও তিনি একটু বল্গাহারা, একটু এলো মেলো বা একটু অসংযত হন নাই। এই সম্বন্ধে আরও বহু কথা লিখবার থাকলেও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে এই অধ্যায় এখানেই শেষে করিতেছি।

ছদকা, খয়রাত, পরোপকার ও গরীবের প্রতি মমত্ববোধ

পীর ছাহেব কেবলা মুছলমানের হাদীয়া নিঃসন্দেহে হালাল হইলে তাহা কবুল করিতেন। আল্লাহ তাঁহাকে অপরিমিত হালাল রুজী অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে পৌঁছাইতেন। একদিকে যেমন আল্লাহ তাঁহার প্রতি সীমাহীন করুণা বর্ষণ করিতেন অন্যদিকে তিনি তাহা দুই হাতে দান করিয়া দিতেন। মিতব্যয়িতার কথাটা এখানে আসিয়া পড়িল। হুজুরের মিতব্যয়িতা দেখিলে মনে হইত নাজানি হুজুর কতই কৃপণ। নাউজোবিল্লাহ্……। কিন্তু হুজুরের দান দেখিলে মনে হইত হুজুর শীঘ্রই ঘর সংসার উজাড় করিয়া দিয়া কোথাও

চলিয়া যাইবেন। একদা দেখিয়াছিলাম হুজুর মাদ্রাছা বোর্ডিংয়ের আনাচ কানাচ হইতে আধ খণ্ড, লঙ্কা এবং ২।৪টি পতিত মসুর ডাল খুটিয়া তুলিতেছেন এবং বলিতেছেন— "আহা এগুলি খেছারত হইয়া গেল!" এইরূপে একটি পয়সার অপব্যয় তিনি জ্ঞাতসারে সহ্য করিতেন না। কিন্তু উহা মালের মমতায় নহে। "নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই"—কোরা'আনশরীফে আল্লাহ্‌র এই আমোঘ নির্দ্দেশ হুজুর সর্ব্বদা নিজ জীবনের সম্মুখে রাখিতেন। আবার—"অমেম্মা রাজাক্না হুম ইউন ফেকুন"—আল্লাহ্‌র এই বাণীকেও জীবনে প্রতিপালিত করিতেন। হুজুরের নিজস্ব একটি দানের তহবিল ছিল। ইহাকে হুজুর নিজে "জাকাতে নাফেলা" বলিতেন। ইহাতে তিনি নিজেই চাঁদা দিতেন আর কাহারও চাঁদা ইহাতে থাকিত না। নিজ প্রাপ্ত প্রতি টাকা হইতে প্রথমে এক পয়সা পরে দুই পয়সা, পরে চারি পয়সা করিয়া জমা করিতেন। কখনও দুই আনা করিয়া জমা করিতেন। এই কাজটি তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন দেশের এক দারুন দুর্ভিক্ষের সময়। তখন অনবরত অভাবগ্রস্থদের ভীড় থাকিত। কাহাকেও তিনি বঞ্চিত করিতেন না। বেশী-কম, যাহার যেরূপ অভাব তাহা বিবেচনা করিয়া নিজ আয়ের প্রতি টাকা হইতে দরিদ্রের অংশ বিলাইয়া দিতেন অথবা দানের উদ্দেশ্যে জমা রাখিতেন। মোটা অঙ্কের এককালীন দানও প্রচুর করিতেন।

একবার এক ব্যক্তি, হজ্বে যাওয়ার এরাদা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার সঙ্গতি ছিল না, আমরা সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করাতে হুজুর তাঁহার সাকুল্য ব্যয়ভার অর্থাৎ ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

নোয়াখালীর জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় বড়ো আলেম সাংসারিক অভাবে খুব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি কোন উপায় অবলম্বনের নিমিত্ত ক্রমাগত কিছুদিন যাবত দোওয়া দরূদ ও অজিফাদি পাঠ করিতে থাকেন। হঠাৎ একদিন হজরত ছরওয়ারে দোজাহাঁ (দঃ)কে উক্ত মওলানা ছাহেব খাবে দেখিলেন এবং রছুলুল্লাহ্ (দঃ) এর খেদমতে নিজ অভাবের কথা আরজ করিলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে যাহা এরশাদ করিয়াছিলেন তাহা উক্ত মওলানা ছাহেব একখানা পত্রযোগে পীর ছাহেব কেবলার গোচরীভূত করেন। এরশাদটি এইরূপ— "শর্ষিণায় নেছারদ্দিন আহমদ নামে আমার এক প্রিয় সন্তান রহিয়াছে। তুমি তাঁহার নিকট তোমার কথা জানাও। তিনি তোমাকে মদদ করিবেন।" এই কথাগুলি উর্দ্দু ভাষায় মওলানা ছাহেব একখানি পোষ্ট কার্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া ডাক যোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাচশত টাকা প্রয়োজনের কথাও জানাইয়াছিলেন। চিঠিখানি হুজুর হাতে পাইয়া আমাদের নিকট দিলেন এবং এই বিষয় কর্ত্তব্য স্থির করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। ইহা লইয়া একটু

মতানৈক্য হইল। অবশ্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপী ক্ষুদ্রকেও হুজুর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিলাম—"হুজুর! ছরওয়ারে দোঁ জাঁহা হুজুরের প্রতি যে, ইঙ্গিত করিয়াছেন, উহাতে সন্দেহের কিছুই নাই, উহা হুজুরের 'শানের' সম্পূর্ণ লায়েক।" হুজুর তখনই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিলেন, কাঁদিলেন, এবং পাঁচ শত টাকা হাতে দিয়া বলিলেন—"এখনি ইনসিওর কর।" অতঃপর ইনসিওর যোগে সেই টাকা উক্ত মওলানা ছাহেবকে পাঠাইয়া দিলাম।

একবার দরবারের এক কর্ম্মীর স্ত্রী বিয়োগ হইল। তাহার দ্বিতীয় বিবাহের প্রাথমিক আয়োজনের জন্য আলোচনা প্রসঙ্গে হুজুর কিছু টাকা বরাদ্দ করিলেন, বলিলেন—"উহাকে আমার কিছু বেশীই দিবার এরাদা ছিল তবে সম্প্রতি ইহার বেশী সম্ভব হইল না।" এই বলিয়া চল্লিশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে হুজুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, বলিলাম—"হুজুর, আপনার অগোচরে আমরা যুক্তি করিয়া ঠিক এই টাকাই বরাদ্দ করিয়াছিলাম।" আমাদের বরাদ্দের সহিত হুজুরের দান আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া গেল, অথচ হুজুরকে আমাদের বরাদ্দ সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই।

মেদিনীপুর জেলায় মাওলানা মোহাম্মদ এরশাদ নামক একটি তরুণ তেজস্বী আলেম ছিলেন। তিনি হুজুরের

নিকট বয়েত গ্রহণ করিবার জন্য আসেন এবং কিছুদিন শর্ষিণায় অবস্থান করিয়া তরিকায় বহুদূর অগ্রসর হন। অকস্মাৎ তিনি রোগ গ্রস্থ হইয়া পড়েন এবং সেই অসুখেই এন্তেকাল করেন। হুজুর সেই তরুণ আলেম মুরীদটির এন্তেকালে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মরহুম মওলানা এরশাদ ছাহেব একটি শিশুপুত্র স্ত্রী ও বৃদ্ধ পিতামাতা রাখিয়া এন্তেকাল করেন। হুজুর সেই বিপন্ন পরিবারকে দীর্ঘ দিন ধরিয়া নিয়মিত অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এমনিতরো ঘটনা হুজুরের জীবনে বহু রহিয়াছে। সম্ভ্রান্ত অভাবগ্রস্থ পরিবারে অযাচিত ভাবে হুজুর বহু টাকা মানিঅর্ডার যোগে বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করিয়াছেন। সাহায্য লাভের জন্য বহু চিঠিপত্র আসিত। বিশেষ করিয়া বিগত পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় হুজুর ব্যাপকভাবে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। নিজ জেলায় এবং জেলার বাহিরে এরূপ বহু দান রহিয়াছে।

শরিয়তের বিধানুসারে জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি হুজুরের সমধিক দৃষ্টি ছিল। টাকা, পয়সা কাপড় ইত্যাদি সব রকম ভাবে তাহাদের তিনি দান করিতেন। হুজুরের প্রতিবেশীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ছিল যাহারা বিগত দুর্ভিক্ষের সময় সর্ব্বস্বান্ত হন। তাঁহারা অবশেষে সব অবলম্বন হারাইয়া একেবারেই হুজুরের দানের উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা

অগত্যা প্রতিদিন বাজারের পথে হুজুরের দরবারে আসিয়া সারি বাঁধিয়া বসিয়া যাইতেন। হুজুর তাহাদের কম বেশী প্রত্যহই দিতেন। অবস্থা ভেদে কাহাকেও প্রচুর দান করিতেন। কোন কোন লোকের আব্দার শেষে এতদূর চরমে উঠিয়াছিল যে তাহারা হুজুরকে রাতিমতো ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। হুজুর অবশ্য তাহাদের বঞ্চিত করিতেন না, কিন্তু সাহায্যের পরিমাণ তাহাদের মন মত না হইলে পাড়াপাড়ি শুরু করিতেন, উঠিতে চাহিতেন না। অবশ্য হুজুর সময়ে একটু আধটু বিরক্তির স্বরে তাহাদের নিকট মাফ চাহিতেন। কটু কথা কিংবা ঝাকুনী কখনও দিতেন না। আমরা সময়ে অধৈর্য্য হইয়া দু, একটা রাগ মন্দ বলিতাম কিন্তু হুজুর আমাদিগকে প্রশমিত করিতেন। হুজুর সারা জীবনে এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি পান নাই। দানছত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং সাধ্যমত দান করিয়াছেন। এই ব্যাপারে হুজুরের অসীম ধৈর্য্য দেখিয়াছি।

হুজুরের প্রথম জীবনে হুজুরের প্রতি একটি আত্মীয়ের কিছু এহছান ছিল। পরে তাহার অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে। হুজুর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে থাকেন। উক্ত সাহায্যের জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ ছিল না। যখন যাহা পারিতেন এমন কি যখন যাহা হাতে উঠিত দিয়া দিতেন। তিনি ক্রমান্বয়ে হুজুরের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। আমার যতদূর মনে পড়ে, হুজুরের অন্তিম কালের অন্যূন দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি একেবারে হুজুরকে পাইয়া

বসিলেন। প্রতিদিন বা প্রতি দুই তিন দিন অন্তর তিনি আসিয়া হুজুরের পার্শ্বে বাজারের ঝুড়িটি লইয়া বসিতেন। কিছু সময় পরে হুজুর তাহার হাতে কিছু গুঁজিয়া দিতেন কিন্তু উহা দুই চারি আনার পয়সা নহে, দুই চার, পাঁচ দশ কিংবা ততোধিক টাকা। কিন্তু প্রার্থী অতৃপ্ত; তিনি আরও চাহিতেন। না দিলে পীড়াপীড়ি করিতেন। সম্ভব হইলে হুজুর আরও দিতেন প্রার্থী হয়ত আরও চাহিয়া বসিতেন; হুজুর এবার একটু বিরক্ত হইতেন প্রার্থী অতৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। আবার তিনি আসিতেন, আবার এইরূপ হইত। হুজুরের অসুস্থতা, কাতরতা, ও ব্যতিব্যস্ততার ভিতরেও উক্ত প্রার্থীর 'অজিফা' ঠিক ছিল। এইভাবে হুজুর তাঁহাকে কত টাকা জীবনে দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। হয়ত কয়েক সহস্র হইবে কিন্তু তিনি খুশী হইয়া যাহা দিতেন তাহাতে তাহার তৃপ্তি কোন দিনই হয় নাই। এই আজব লোকটি সম্পর্কে আমরা সবাই একান্ত বিরক্ত ছিলাম। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতাম যাহাতে তিনি হুজুরকে এইরূপ বিরক্ত ও উৎপীড়ন না করেন, কিন্তু কোন দিনই তিনি তাহা কানে তুলেন নাই এবং দান পাইয়া তিনি শোকর করেন নাই। নিত্যকার এই উৎপীড়ন হুজুর হয়ত জীবনের একটি ধৈর্য্যের পরীক্ষা হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; নতুবা ইহা সহ্য করা এক অসাধারণ ব্যাপার ছিল।

বিরক্তি জনক ঘটনা এরূপ আরও বহু ঘটিত; তবু হুজুরকে দিতে হইত। এইভাবে প্রতিদিন বৈঠকে তিনি বহু লোককে দান করিতেন। বিগত পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষের সময় হুজুর নিজ গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদের জন্য ব্যাপক সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজনের তুলনায় হুজুরের একার পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না; তাই গ্রামের স্বচ্ছল লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটি পঞ্চগ্রাম সাহায্য সমিতি গঠন করেন। সেই সমিতির মারফত গ্রামবাসী অভাবগ্রস্থদের তালিকা প্রনয়ণ করিয়া সকলকে যথাশক্তি সাহায্য বিতরণের কাজ আরম্ভ করেন। এই তহবিলে হুজুর বহু টাকা দান করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত এই তহবিল পরিচালিত হইয়াছিল। সেরূপ একটি আদর্শ রিলিফ কার্য্য তখন কোথাও চলিতে দেখি নাই। ইহাতে গ্রামের দরিদ্রদের অভাব বহু পরিমাণে মোচন হইয়াছিল।

হুজুর সেই সময়ে নিজস্ব একটি বস্ত্র বিতরণ তহবিল গঠন করেন। উক্ত তহবিলের অর্থ দ্বারা হুজুর নিজে কাপড় কিনিয়া নিজ হাতে রাখিয়া দিতেন। ক্রমাগত হুজুর এইভাবে কয়েক হাজার টাকার কাপড় বিতরণ করিয়াছিলেন। চার পাঁচ-শত কখনও হাজার টাকার সাড়ী লুঙ্গি প্রভৃত ক্রয় করিয়া অভাব-গ্রস্থদের মধ্যে উহা বিতরণ করিতেন। আমরা উহার একটি বিরাট লিষ্ট তৈয়ার করিয়াছিলাম।

বিপদে আপদে, নৌকা ডুবিতে, গৃহ দাহে ও রোগ চিকিৎসায় বহুলোক হুজুরের নিকট অপ্রত্যাশিত সাহায্য লাভ করিয়াছেন।

হুজুরের দরবারে খেদমতের জন্য সব সময়ে বহু লোক থাকিত। কেহ কুলুখ তৈয়ার করিতেন, কেহ গরু বকরী পালন করিতেন, কেহ বাবুর্চ্চি খানায় কাজ করিতেন, কেহ বা হুজুরের কাপড় ধুইয়া দিতেন ইত্যাদি। তাহারা সকলেই জান প্রাণ ঢালিয়া দিয়া হুজুরের কাজ করিতেন। হুজুর মাঝে মধ্যে তাহাদিগকে কাপড় কোরতা দান করিতেন; আবার কাহাকেও বেশ কিছু কিছু থোক টাকাও এককালীন সাহায্য করিতেন। হুজুরের খাইয়া পরিয়া এরূপ সাহায্য লাভ না করিয়াছে দরবারে এমন বলিতে গেলে কেহই বাকী ছিল না।

কেবল বাড়ীতেই নহে, ছফরেও হুজুরের দানের বস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং গরীব দেখিলে তাঁহাকে কাপড় দান করিতেন।

কোনস্থানে সভায়, মাদ্রাছার চাঁদা ইত্যাদির প্রশ্ন উঠিলে হুজুর সর্ব্বাগ্রে সেখানে টাকা দান করিতেন। বহু মাদ্রাছাহ্ এবং মছজিদে হুজুরের ছোট বড় দান রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া হুজুরের বহু গোপন দানও ছিল যাহা আমাদের অনেকেরই জানা নাই এবং এমন অনেক দান রহিয়াছে যাহা আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। আবার এমন অনেক দান রহিয়াছে যাহা হুজুর নিজেই জানিতেন না। অর্থাৎ হাত মুঠি করিয়া পকেট হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। কতো উঠিয়াছে তাহা হুজুর জানিবার চেষ্টা করেন নাই, প্রার্থীকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ ডাহিন হাতের দান যাহা বাম হাত জানিতনা।

হুজুর দানের বিষয় এতো অধিক মুক্ত হস্ত ছিলেন যে তাহা আমাদের লেখার সাধ্য নাই। সুতরাং এই অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত করিতেছি।

পীর ছাহেবের প্রতি অমুছালমদের ভক্তি

পীর ছাহেবের বাড়ীর প্রায় চারি পার্শ্বে হিন্দুদের বাস। তাঁহারা পীর ছাহেবকে একান্ত আপন জন বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কেহ কেহ 'পরম সাধু' কেহবা তদাপেক্ষা বড়ো কিছু এবং কেহবা 'স্বয়ং' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অবশ্য তাঁহাদের কোফরি বিশ্বাসের আমরা প্রতিবাদ করিতাম এবং আমাদের বিশ্বাস তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম।

বহুবার এমন ঘটিয়াছে যে, কোনও হিন্দু দর্শন প্রার্থী হুজুরকে দেখা মাত্র আভূমি প্রণত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় হুজুর ভীষণ গর্জ্জনে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছেন 'কি করিয়াছ? কি করিলে? সর্ব্বনাশ করিলে'!! বলিতে বলিতে নিজ আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছেন এবং মুখে 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা পড়িতে শুরু করিয়াছেন। ছোট খাট একটা হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে। দর্শন প্রার্থী একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। "কি হইল"? ভয়ে, বিস্ময়ে তাঁহার অবস্থা কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। অবশ্য বিষয়টির গুরুত্ব

আমরা পরে তাহাকে খুব ভাল ভাবে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম কিন্তু তিনি কি বুঝিতেন তাহা তিনিই জানিতেন।

তবে মোছলমান মাত্রেই এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিতে বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ যদি কেহ কাহাকে ছেজদা করে, তবে শরিয়তের বিধানুসারে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ শেরক ও কুফরের গুনাহে পতিত হইবে, তাঁহার ঈমান সেইক্ষণে বরবাদ হইয়া যাইবে। এতো গেল ছেজদা কারীর অবস্থা! ছেজদা যাহাকে করা হইল, যে যদি উহা গ্রহণ করে, এমন কি ইহাতে সে তিলমাত্র গর্ব্বিত বা তৃপ্ত হয়, তবে, তাহার প্রতিও শরিয়তের একই নির্দ্দেশ বর্ত্তিবে। সুতরাং অনুরূপ ঘটনায় পীর ছাহেবের ঐরূপ শঙ্কিত ও অস্থির হইয়া উঠা একান্তই স্বাভাবিক ছিল। আমাদের সম্মুখে এরূপ ঘটনা বহুদিন ঘটিয়াছে।

হুজুর যখন দেখিলেন যে, প্রায় হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ একটি ছেজদা দিবার মনোভাব বিরাজ করে; তখন তিনি অধিক সতর্ক হইলেন এবং দর্শনার্থী কোনও সাধারণ শ্রেণীর হিন্দুকে আসিতে দেখিলে তখন একটু দূরে থাকিতেই তাহার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং হুজুরের নিজ খানকা শরীফের বারন্দার সন্নিহিত স্থানে রক্ষিত একখানি আসনে বসিতে নির্দ্দেশ করিতেন। কারণ, তাহার নিকটে আসিয়া পড়িলে হয়তো ছেজদাই করিয়া বসিবে নতুবা শুধু 'নমস্কার' করিতে গেলেও মাথা নত করিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। কাজেই হুজুর বাধ্য হইয়াই হিন্দু দর্শক দিগকে নমস্কারের সীমার বাহিরে থাকিতেই বসিবার ইঙ্গিত

করিতেন, যেন তাহারা 'কোফরি' কিছু করিবার সুযোগ না পায়। অবশ্য ইহা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাক্ষা সম্ভব হইতনা। অগণিত অনিয়মিত দর্শন প্রার্থীদের সঙ্গে মিশিয়া আসিয়া হঠাৎ পদ প্রান্তে এক ছেজদা দিয়া মহা হট্টগোল বাঁধাইয়া তুলিত।

কেহ আসিয়া বলিত "আপনি স্বয়ং" আপনার ইচ্ছা। হুজুর বড়ো বিপদে পড়িতেন। সময়ে হুজুর হাসিয়া ফেলিতেন, বলিতেন "বলে কি? লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহে" বলিয়া দিতেন "বেটা আমি মানুষ" বলো, খোদার ইচ্ছা। তাহাকে বলাইয়া হুজুর নিস্কৃতি পাইতেন। এইরূপে ভক্তির আতিশয্যে হিন্দু দর্শন প্রার্থী কোফরী কার্য্য কলাপ করিয়া ফেলিতেন হুজুর সে গুলির প্রতিবিধান করিয়া দিতেন। আমরা পার্শ্বোপবিষ্টগণও এই বিষয়ে হুজুরের সাহায্য করিতাম।

কিন্তু স্থানীয় এবং বিদেশী বহু হিন্দু, যাহারা হুজুরের প্রভাব প্রতিপত্তি, কারামত সাধনা আরাধনা ত্যাগ, ও মহিমা দেখিয়াছে, তাহারা মনে প্রাণে হুজুরকে একজন 'অবতার' জ্ঞান করিয়াছে। তবে যেহেতু হুজুর উহাতে কদাচ রাজী ছিলেন না এবং আমরা সকলেই ইহার প্রতিবাদ করিতাম, সেইজন্য উহা তাহারা দূরে দূরে আমাদের অগোচরে আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু সাক্ষাতে হুজুরের কথায় এবং আমাদের কথায় সায় দিয়া গিয়াছে।

বেশীর ভাগ হিন্দু হুজুরের নিকট আপদ বিপদে 'ত্রাণ' প[illegible]ন্য আসিতেন। হুজুর তাহাদের বিশ্বাস পালটাইয়া

দিতেন এবং বলিয়া দিতেন যে, আল্লাহ্ই সকল বিপদের ত্রাণ-কর্ত্তা। অতঃপর যাহা কিছু ফিকির তদবীর দিয়া দিতেন। হুজুর সাধারণভাবে হিন্দু মুছলিম নির্ব্বিশেষে সকল ব্যধি-পীড়ার তদ্‌বীর প্রার্থীগণকে তেল, পানি এবং কালজিরা ব্যবহার করিতে দিতেন। হিন্দুরা উহা নিয়া পরম সমাদরে ব্যবহার করিতেন এবং অনেকেই রোগ-মুক্ত হইতেন ইহা আমরা শুনিয়াছি।

মৃনালিনী নাম্নী একটি হিন্দু বিধবা তাহার পুত্রবধুর কঠিন পীড়া বহু চিকিৎসা করতঃ অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া হুজুরের শরণাপন্ন হইল। কতো কাকুতি মিনতি করিয়া যে হুজুরকে চিঠি লিখিত তাহা পাঠে মর্ম্মস্পর্শ করিত। হুজুর অবশ্য নিজে প্রায়ই কোনও চিঠিপত্র পড়িতেন না, চিঠিগুলির মর্ম্ম জ্ঞাত হইতেন এবং সংক্ষেপে জওয়াব বলিয়া দিতেন। মৃনালিনীর চিঠিগুলিও আমরাই পড়িতাম এবং হুজুরকে মর্ম্ম শুনাইতাম। হুজুর সেই বিধবার পুত্র বধুর জন্য তদবীর দিতেন, তাহাতেই নাকি সে ভাল হইয়াছিল।

হিন্দু দর্শনার্থীগণ হুজুরের জন্য ফল, মূল দুধ কলা ও টাকা-পয়সা ইত্যাদি নিয়া আসিতেন। হুজুর তাহাদের হাদিয়া গ্রহণ করিতেন না, আবার রূঢ় ভাবে প্রত্যাখান করতঃ মনও ভাঙ্গিয়া দিতেন না। একান্ত মিষ্টভাবে বলিতেন "দেখ, এগুলি আনিয়াছ, আমি পাইয়াছি—আমাকে ভক্তি করিয়া যদি আনিয়া থাক তবে আমার কথা শোনো

এগুলি নিয়া যাও, দেখ এসব আমার অনেক রহিয়াছে আমার মোটেই দরকার নাই, তারচেয়ে ধরো, কাছে নিয়া আস, আমি ফুঁকিয়া দেই, এগুলি ঘরে তোমরা সবাই মিলিয়া খাইও, মনে করিও, আমি দিলাম ; অথবা বলিতেন—"তোমাদের মধ্যে যারা গরীব তাদেরে দিয়া দিও, এতে তোমাদের ফল হইবে।" এমনি করিয়া কহিয়া বলিয়া রাজী করিয়া ফিরাইয়া দিতেন।

হিন্দুগণ তাহাদের ধর্মাশ্রমে ও প্রতিষ্ঠানাদিতে হুজুরকে নিতেন। একবার বরিশালের গৈলা অঞ্চলে একটি আশ্রমে পীর ছাহেবকে নিবার জন্য কতিপয় হিন্দু তরুণ যুবক আসিয়া ধরিলেন। পীর ছাহেব অগত্যা বলিলেন—"দেখ! তোমরা মুর্ত্তি, ছবি ইত্যাদি ঘরে রাখিয়া থাক, আমাদের ধর্ম্মে ঐ সব স্থানে যাওয়ায় বাঁধা আছে! তারা বলিলেন—"পীর ছাহেব, আমরা ওসব যা'কিছু আছে সড়াইয়া ফেলিতেছি, আপনি দয়া করিয়া পদার্পণ করুন! হুজুর সম্মত হইয়া সেখানে গেলেন এবং কিছুক্ষণ তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিলেন, এবং তাদের উদ্দেশ্য শ্রবণ করিলেন, অতঃপর চলিয়া আসিলেন।

প্রতিবেশী হিন্দুরা পীর ছাহেবকে হিতাকাঙ্ক্ষী ন্যায় বিচারক এবং বিপদের বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন দুর্য্যোগের সময় গুলিতেও হিন্দুরা একান্তভাবে পীর ছাহেবের ছায়ায় নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চন্ত মনে জীবন যাপন করিতেন।

পীর ছাহেবের স্বজন ও গ্রামবাসী

প্রতিবেশী আত্মীয়, অনাত্মীয়, উচ্চ, নীচ এবং আপন, পর সকলের সহিত হুজুরের ব্যবহার একান্ত উদার, মহৎ এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল। তিনি প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীর কাজে বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করিতেন। প্রতিবেশীর ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, বিসংবাদ পীর ছাহেবকে প্রায়ই মিটাইতে হইত। এই কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন হুজুরকে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়াছি। পীর ছাহেব যে একজন হাদী আলেমই ছিলেন তাহা নহে, বরং তিনি একজন অতি সূক্ষ্ম বিচারকও ছিলেন। স্থানীয় হাকীম এই জন্য বহু মোকাদ্দমা মীমাংসার জন্য হুজুরের উপর ন্যাস্ত করিতেন। গ্রামবাসীরা সকলেই যে হুজুরের মুরীদ এবং ভক্ত ছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু হুজুরের বিচার এবং শালিসীর উপর তাহাদের একান্ত বিশ্বাস এবং আস্থা ছিল। এই জন্য গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ঘটিলে হুজুরকে শালিস মান্য করিতেন এবং তিনি যে বিচার করিতেন উহা চূড়ান্ত বলিয়া মান্য করিতেন। ইহাতে গ্রামবাসীরা যে কতো মামলা মোকদ্দমা এবং শত্রুতা ও বিবাদের হাত হইতে রেহাই পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

হুজুরকে সকলে একবাক্যে মানিয়া নিলেও তিনি যে কোনও বিচার মীমাংসায় গ্রামের মাতবরদিগকে উপেক্ষা করিতেন না; বরং সব ব্যাপারেই তাঁহাদিগকে ডাকিতেন কিংবা বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে মান্য করিতে বলিতেন। এইভাবে নিজ গ্রামের মাতবর ও প্রধানগণের যথার্থ মর্য্যাদা তিনি রক্ষা করিতেন। গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণের অনেকেই পীর ছাহেবের একান্ত অনুগত মুরীদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহাদের স্ব স্ব মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন; হুজুরের দরবারে হাজীর হইলে তাহাদিগকে যথারীতি আসনাদি দিতেন, আদর আপ্যায়ন করিতেন; তাঁহাদের কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিতেন, মত প্রকাশ করিবার সুযোগ দিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া হাসিমুখে কথা বলিতেন।

প্রতিবেশী বা গ্রামবাসী কাহারও অসুখ বিসুখ হইলে তিনি যথা সম্ভব দেখিতে যাইতেন, পুরুষ হইলে গিয়া কাছে বসিতেন, ঝাড় ফুঁক করিতেন, এবং তদবীর ও সান্ত্বনা দান করিতেন; ফলমুল কিছু না কিছু নিয়া যাইতেন; আবশ্যক হইলে ঔষধ পথ্যের জন্য টাকা পয়সা পর্য্যন্ত দিতেন। প্রতিবেশী হিন্দুদের বেলায়ও তিনি একই ব্যবহার করিতেন।

গ্রামের কাহারও মৃত্যু হইলে হুজুর আপন জনের ন্যায় শোকার্ত্ত হইতেন, কখনও নিজ মৃত্যু চিন্তায় সাশ্রু নয়নে রোদন করিতেন। মৃতের মাগফেরাতের জন্য নিজ মাদ্রাছার ছাত্রগণ দ্বারা কোরআন শরীফ পাঠ করাইতেন। পীর ছাহেবকে নিবার

পূর্ব্বে তিনি নিজেই সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন, নৌকায় কিংবা পদব্রজে যাইয়া মৃতের দাফন কাফন কার্য্যাদির ব্যবস্থা তদারক করিতেন এবং শরিয়তের নির্দ্দেশমতো যাহাতে কাফন ও দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। শরিয়তের বিধানানুযায়ী কবর খুঁদিবার পদ্ধতি নিজেই দেখাইয়া দিতেন। তিনি নিজেই কিংবা কাহারও দ্বারা মৃতের ওলীর অনুমতি মতে জানাজা সমাধা করাইতেন এবং পরিশেষে মৃতের ওয়ারেছগণকে সান্ত্বনা ও আবশ্যক পরামর্শ দান করিতেন।

হুজুর প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদের আকিকা ও বিবাহ ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেন। তাহাদের বিবাহে সম্মতি দান করিতেন। উভয় পক্ষের চুক্তি নিজে শ্রবণ করিতেন, কাবিনের শর্ত্তাদি হুজুর নিজ লেখকদ্বারা লিখাইয়া দিতেন এবং শর্ত্তনামায় সময়ে দস্তখত করিতেন। বিবাহের কলেমা নিজেও কিংবা হুজুরের অনুমতি মতে কেহ পড়াইয়া দিতেন। যাহারা হুজুরের সম্মুখেই কলেমা পড়াইতে চাহিতেন, তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। হুজুর 'নওশা' এবং সংশ্লিষ্ট লোকজনের জন্য বিছানাদি দেওয়াইতেন; অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রতিবেশী ছাড়া অন্যান্যদের জন্যও করিতেন।

প্রতিবেশীদের দাওয়াৎ—অবশ্য কোনও ওজর না থাকিলে কবুল করিতেন এবং সেখানে যাইয়া খাইয়া আসিতেন। হুজুরের জীবনের শেষ ভাগে বহু কারণে, বিশেষতঃ সময়ের

অভাবের জন্যই গ্রামে কাহার বাড়ীতে যাইয়া 'দাওয়াৎ' খাইতে পারেন নাই।

প্রতিবেশীরা তাঁহাদের সামাজিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক প্রায় প্রতি কাজে পীর ছাহেবের পরামর্শ এবং অনুমতি লওয়া জরুরী এবং কল্যাণজনক মনে করিতেন। বিবাহ, ব্যবসায়, বাণিজ্য, ঘর করা, পুকুর কাটা, দোকান করা এমনি শত শত বিষয়ের পরামর্শ এবং অনুমতির জন্য গ্রামবাসীরা পীর ছাহেবের পার্শ্বে ঘিরিয়া থাকিতেন। ইহাতে হুজুর কোনও দিনই কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। যাহাকে যেমন প্রয়োজন, এবং যিনি যেমন ভক্তি বিশ্বাস রাখিতেন, তাঁহাকে তিনি সেই অনুরূপ পরামর্শ দিতেন। সকল কথা ও সকল পরামর্শের ভিতর দিয়া পীর ছাহেব তাঁহাদের মন ধীরে ধীরে আল্লাহও তদীয় রছুলের তাবেদারী এবং ভালবাসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেন।

পীর ছাহেব নিজ বাড়ীর কাজ-কর্ম্মে প্রতিবেশীদের ডাকিতেন, দাওয়াৎ করিতেন, শরীক করিতেন এবং কেহ অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার খোঁজ নিতেন ও কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। এইভাবে তিনি সকল নেকীর কর্য্যে তাঁহাদিগকে শরীক করিতেন।

পীর ছাহেবের নিজ প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহারা তাঁহার পূর্ব্বে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা তিনি বিস্মৃত হইতেন না। প্রায় প্রতি মোনাজাতে তিনি তাঁহাদের জন্য

মাগফেরাত চাহিতেন এবং রুহের উপর ছওয়াব প্রেরণ করিতেন। মৃত জ্ঞাতীও স্বজনগণের কথা প্রায়ই স্মরণ করিতেন। একবার তিনি মৃত গ্রামবাসীদের একটি দীর্ঘ নামের তালিকা তৈয়ার করিয়াছিলেন। উহা তিনি সময়ে সময়ে বাহির করিয়া পাঠ করিতেন এবং দীর্ঘ সময়ে ব্যাকুলভাবে রোদন করিতেন।

প্রতিবেশীদের দ্বারা কোনও শরিয়তের বিরোধী কাজ হইলে তিনি বড়ো ব্যথিত হইতেন এবং ইহার প্রতিবিধানের জন্য তাহাকে ডাকিয়া কাহাকেও গোপনে কাহাকেও মৃদু ভৎসনা দ্বারা কাহাকেও বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিতেন।

প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলেদের হুজুর স্নেহ করিতেন, কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাদের পড়াশুনার সংবাদ পিতামাতারও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং কখনও কখনও হাতে কিছু ফলমূল খাইতে দিতেন।

প্রতিবেশীদের মধ্যে 'দুই একজন পীর ছাহেবের ঘোর বিরোধীও না ছিলেন এমন নয়। একজন প্রতিবেশীর সম্পর্কে আমরা জানিতাম যে, তিনি হুজুরের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যদিও তাহার সহিত কোন দিক দিয়াই হুজুরের তুলনা হইতনা, তবুও তিনি নিজকে মানে' সম্মানে, ও জ্ঞানে প্রতিপত্তিতে নিজেকে হুজুরের প্রতিদ্বন্দী বলিয়া মনে মনে ধারণা করিতেন এবং স্থানে, অস্থানে নিজের জ্ঞানের বড়াই এবং হুজুরের নিন্দা কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। আমরা যেহেতু হুজুরের

সাহচর্য্যে থাকিতাম, সেই হেতু রাস্তাঘাটে পাইলে সুযোগ মত্তো মনের ঝাল মিটাইয়া আমাদিগকে দু'চার কথা শুনাইয়া দিতেন। পীর ছাহেবের জীবন সায়াহ্নে উক্ত প্রতিবেশীটির বিদ্বেষ অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই তিনি একখানা পুস্তক মুদ্রন করিয়া পীর ছাহেবকে নিন্দিত করিতে যাইয়া দুনিয়ার সকল পীর বোজর্গ এবং ওলি আওলিয়াদের উপর জঘন্য আক্রমণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বইখানার বিষয় হুজুর অবগত হইয়াছিলেন কিন্তু, কোনরূপ মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

এই ঘটনার পরে হুজুরের সম্মুখে একটি গ্রাম্য বিচার আসিল। বিচারটিতে উক্ত প্রতিবেশী প্রবরকেও একজন শালিস মান্য করা হইয়াছিল। যদিও সেই ব্যক্তি বয়েসে এবং রেস্তায় হুজুরের অনেক ছোট ছিলেন, তথাপী 'হুজুর' সেদিন সে লোকটীকে বড়ো মিয়া " এবং আপনি' 'সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং বিচারটি বড়ো মিয়ার হাতেই হুজুর ছোপর্দ্দ করিলেন।

অতো বড়ো শত্রুতা যে করিল, হুজুর তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেন!

পীর ছাহেবের একটি প্রতিবেশী ছিল অত্যন্ত ঝগরাটে ও হীন প্রকৃতির; সর্বদাই তাহারা ভাই, ভাই, মাতা পুত্রে ঝগড়া ঝাটি করিত। পীর ছাহেব তাহাদের সেই কলহের উৎপীড়নে বহু জ্বালাতন ভোগ কারতেন। প্রায়ই তাহাদের কলহ বিবাদ মিটাইতে হইত। একদিন ইহাদের একজন ঝগড়ার সময় উত্তেজিত হইয়া নিজ মাতাকে প্রহার করিল। বড়ো সোর গোল হইল; হুজুর শুনিতে পাইলেন, কিন্তু সেদিন আর হুজুর সহিতে পারিলেন না।

"মায়ের উপর অত্যাচার, হুজুর বড়ো রাগিয়া গেলেন এবং ছুটিয়া গিয়া দুর্বৃত্তকে পায়ের জুতা দিয়া বেদম প্রহার করিলেন। হুজুর রাগে একেবারে হাপাইয়া গিয়াছিলেন। দেখিলাম, তিনি ঘর্ম্মাক্ত এবং পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিতেছেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে মুখে ভৎসনা করিতেছেন।

হুজুরের প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতি ব্যতাত একাধিক গোত্রও সমাজের অস্তিত্ব ছিল। ইহা থাকা স্বত্বেও পীর ছাহেব নিরপেক্ষ এবং সকলের আপন জন হিসাবে চলতেন। তিনি কাহারও অধিক আপন এবং কাহারও অপেক্ষা কত কম, এই মনোভাবের বহু উর্দ্ধে ছিলেন। তবে শরিয়তের নির্দ্দেশ মতে নিকবর্ত্তী জনের যে সব ব্যাপারে অগ্রগণ্যতা রহিয়াছে তাহা তিনি পালন করিতেন। প্রতিবেশীর ইয়াতিম, বিধবা এবং দুর্দ্দশা-গ্রস্থ দিগকে জীবন-ভর সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতেন।

শর্ষিনায় ছোট লাটের আগমন।

জনাব এ, কে ফজলুল হক ছাহেব তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার প্রচেষ্টায় তদানীন্তন বাংলার ছোট লাট স্যার হার্ব্বর্ট হক ছাহেবের আমন্ত্রণক্রমে শর্ষিনার পীর ছাহেবের মাদ্রাছাহ এবং চাখার কলেজ পরিদর্শন করিতে রাজী হন শর্ষিনায় তার যোগে সংবাদ আসিল। পীর ছাহেব ইহাতে স্বাভাবিক ভাবেই খুশী হইলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাছাহ্ লাট ছাহেব কর্ত্তৃক পরিদর্শিত হইবে, ইহাতে তিনি খোদার শোকরিয়া আদায়

করিলেন। জিলা এবং মহাকুমা হইতে রাজ কর্ম্মচারীরা শর্ষিনায় লাট ছাহেবের অভ্যর্থনার আয়োজন দেখিতে আসলেন। স্থানীয় মহাকুমা হাকীম লাট ছাহেবকে অভ্যর্থনা সংক্রান্ত একটি বিরাট তালিকা তৈয়ার করিয়া পীর ছাহেবকে দিলেন। তালিকাতে যে সকল বিষয় ছিল তাহার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। স্বরূপকাঠী হইতে পীর ছাহেবের বাড়ী পোয়া মাইলের একটু বেশী। এই পথটি লাট ছাহেবকে পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইবে। সুতরাং সেই দীর্ঘ পথটি সমস্ত শালু কাপড়ে আবৃত করিতে হইবে। সেই পথের উভয় পার্শ্বে কয়েক হাত ব্যবধানে জীবন্ত কলাগাছ পুঁততে হইবে। অবতরণ স্থলে একটি বিরাট তোরণ ও গম্বুজ তৈযার করিতে হইবে; ইত্যাদি। আরও মজার খবর এইযে, লাট ছাহেবের সঙ্গে তদায় পত্নী লেডি হার্ব্বার্ট ও পীর ছাহেবের বাড়ীতে আসবেন!

সাজ-সজ্জার ফর্দ্দ শুনিয়া পীর ছাহেব অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মহাকুমা হাকীমকে বলিলেন "জনাব! আমি একটি ফকির মানুষ! আমার এখানে মাঝে মাঝে বহু আলেম ওলামা তশরীফ আনিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের তাজীমের জন্য স্বাভাবিক ভাবে যে টুকু আয়োজন করিয়া থাকি; উহার বেশী কিছুই করিতে পারিব না; জানিয়া রাখুন, আমি আল্লাহকে চাই, লাট ছাহেব যদি দয়া করিয়া ফকিরের অস্তানায় আসেন, সুখের বিষয়, কিন্তু আপনাদের ফরমায়েস মতে আমি কোনও সাজ-সজ্জা করিতে অপারগ!" পিরোজপুরে তখন মহাকুমা হাকীম ছিলেন

জনাব চৌধুরী আব্দুল হালীম ছাহেব! তিনি অতি বিচক্ষণ এবং খোদা পরায়ণ ছিলেন। তিনি পীর ছাহেবের আন্তরিক ভাব অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি পীর ছাহেবের উক্তরূপ স্পষ্ট উক্তিতে নারাজ না হইয়া বরং অতিষয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন; "হুজুর! মাফ করুন! এই ব্যাপারে আপনিই আমাদের ছিপাহ্‌ছালার! আপনার মরজী মোতাবেকই কাজ হইবে।" যাহা হউক! এদিক দিয়া পীর ছাহেব অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু লেডী হার্ব্বার্টের উপস্থিতি সম্পর্কে একটি মছিবৎ রহিয়া গেল। যে দরবারে জীবনে কেহ একটি ক্ষুদ্র বালিকার উপস্থিতি দেখে নাই, সেখানে প্রকাশ্য ইছালে ছওয়াবের মাহফিলে, শত শত আলেম ওলামা, দীনদার, পরহেজগার ও মোত্তকীগণ পরিবেষ্টিত সভায় একটি ইংরেজ রমনী তাহার স্বাভাবিক বেশ-ভূষায় ইছালে ছওয়াবের পবিত্র মঞ্চে আরোহণ করিবেন ইহাতে পীর ছাহেব এবং জনসাধারণ কিরূপে রাজী হইতে পারেন? সুতরাং হুজুর বিপদেই পড়িলেন। পীর ছাহেব ইহার প্রতিকারের জন্য যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন তিনিই ইহার প্রতিকারে অসমর্থতা জ্ঞাপন করিলেন। বাংলার লাট তাহার পত্নী লইয়া ভ্রমণে বাহির হইবেন, সরকারী কর্ম্মচারী সবাইতো তাঁহার অধীন। সুতরাং এবিষয় কাহারও টু শব্দটী করিবার সাহস না থাকাই স্বাভাবিক। পীর ছাহেব বড়োই প্রমাদ গনিলেন এবং আত সকাতরে আল্লাহের দরবারে সেই

'মুছিবৎ' হইতে 'নাজাতের' ফরিয়াদ জানাইলেন। তিনি বহুদিন কথা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তিনি সত্যিকার ভাবে খোদা-পাকের দরবারেই সেই অবাঞ্ছিত ঘটনাটি হইতে মুক্তি চাহিয়াছিলেন! আল্লাহ পাক যে তাঁহার কাতর ফরিয়াদ শ্রবণ করিয়াছিলেন সেই শোকর গোজারীর জন্যই তিনি এই আলোচনাকালে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। অভাবিত উপায়ে লাট পত্নীর উক্ত সভায় যোগদান স্থগিত হইয়া গেল। লাট সাহেবের পক্ষ হইতে টেলীগ্রাম আসিল যে, কোনও মহিলাই যেন এই সভায় যোগদান না করেন! তার পাইয়া পীর ছাহেব অতিষয় আশ্বস্ত হইলেন এবং আল্লাহর হাজার হাজার শোকরিয়া আদায় করিলেন।

তখন দ্বিতীয় মহা-সমর চলিতেছে। জাপানী আক্রমণাশঙ্কা ভারতে বৃটিশকে বড়ো বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। পীর ছাহেবের প্রোগ্রাম ছিল যুদ্ধে ভারতবাসীর নিরাপত্তার জন্য দোওয়া করা। লাট ছাহেবকে যথা-বিহিত মান-পত্রাদি দেওয়া হইয়াছিল। জনাব এ, কে ফজলুল হক ছাহেব মান-পত্র পাঠ করিয়াছিলেন। পীর ছাহেব তাঁহার স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য্য সহকারে মোনাজাত করিলেন।

পীর ভক্তি

মোর্শেদ বা আধ্যাত্মিক ওস্তাদগণের নিকট নিজ সকল ইচ্ছা ও বাসনাকে বিকাইয়া দেওয়ার নাম 'বাইয়াৎ'। নিজ আধ্যাত্মিক ওস্তাদগণের নিকট যে শাগরেদ যতোখানি বিলীন হইতে পারিবে, নিজেকে ছোপর্দ্দ করিতে পারিবে মুরীদ হিসাবে সে ততোখানি উপযুক্ত, এবং তাহার মকছুদ সেই পরিমাণ হাছেল হইবে।

আমাদের পীর ছাহেব কেবলা পীর ভক্তির উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি মোরশেদকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য আল্লাহকে পাওয়ার সর্ব্বোচ্চ অবলম্বন মনে করিতেন এবং সেই হিসাবে তাঁহার তাবেদারী করিতেন। তিনি নিজ মোর্শেদের নিকট একান্ত অবোধ শিশুর মতোই থাকিতেন। তিনি নিজ মতামত, স্বকীয় জ্ঞান বা বুদ্ধি পীরের সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে প্রয়োগ করিতেন না। পীরের নির্দ্দেশ যাহাই হইত, উহাতেই কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, বলিয়া বিশ্বাস করিতেন উহা নিজ বিবেক বুদ্ধির অনুকুল হউক, কি না-ই হউক, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না।

নিজ মোর্শেদের সম্মুখে তিনি এরূপ ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন যে, না ডাকিলে সম্মুখে যাইতে কিংবা জিজ্ঞাসা না করিলে কথা বলিতে সাহস করিতেন না। আমাদের পীর ছাহেব কেবলা প্রায়ই বলিতেন "আমি দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ পীরের পশ্চাতে ঘুরিয়াছি, পীরের বাড়ীতে নিজ মনে মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছি, সেখানে মাহফিলের পর বাড়ীর ময়দান পরিষ্কার করার বেলায় সকলের সঙ্গে আমিও গোশতের হাড় কুড়াইয়া বাড়ী ছাফ করিয়াছি।"

প্রসঙ্গক্রমে একদিন হুজুর উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তিনি তদীয় মোর্শেদের বাড়ীতে মাঠে উলু কাটিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু, যেহেতু আমাদের পীর ছাহেব এসব কাজে অনভ্যস্থ ছিলেন তাই তাঁহার মোর্শেদ কেবলা অনভ্যস্থ হাতের কাজ দেখিয়া হাসিয়াছিলেন এবং সহাস্যে তাঁহার হাত হইতে কাঁচি ছিনাইয়া নিয়া বলিয়াছিলেন "কি করছো গো! অমন ধারা কাটে নাকি গো? দাও জিকিনি আমার কাছে!" এই বলিয়া তিনি হাত হইতে কাঁচি নিয়া নিজেই কতোগুলি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন।

পীর ছাহেব নিজ পীরের বাড়ীতে যাইতেন—খাদেম বা বন্ধু-বান্ধব নিয়া নয়, লেবাছ পোষাকে সাজ-সজ্জা করিয়াও নয়, একা, একান্ত দীনভাবে, সংযতভাবে, সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত মনে। তিনি কম্বল মাত্র সম্বল করিয়া যাইতেন এবং একান্ত দীনতার সহিত যেখানে সেখানে, কিংবা মছজিদের বারান্দায়

কম্বল বিছাইয়া পড়িয়া থাকিতেন। পীর ছাহেব তদীয় মোর্শেদ কেব্লার বাড়ীতে প্রতি বৎসর বার্ষিক মাহফিলে যোগদান করিতেন লক্ষাধিক মুরীদ ও অগণিত দর্শক সেই সভায় যোগদান করিতেন। আমাদের পীর ছাহেব ও যাইতেন; ঠিক যেন একজন সাধারণ যাত্রী, সঙ্গী সাথী বর্জ্জিত আত্ম-পরিচয় বিসর্জ্জিত একজন পথিক।

আমরা অবশ্য দু'একজন পীর ছাহেবের সহিত ফুরফুরা শরীফ গিয়াছি, কিন্তু পীর ছাহেবের খাদেম হিসাবে নয় বা তাঁহার খরচেও নয়, বরং সম্পূর্ণ সতন্ত্রভাবে, নিজ নিজ দায়ীত্বে এবং নিজ নিজ ব্যয়ে। অবশ্য তখন তিনি একজন বিরাট খ্যাতিমান পীর, তাঁহার মোর্শেদের দরবারেও তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা বলিয়া পরিচিত; কিন্তু, সেই সময়েও তাঁহাকে কোনও বিশেষ আয়োজন করিতে দেখি নাই, তিনি নিজে যা বহন করিতে পারিতেন, উহাঁর অতিরিক্ত 'ছামান' বা বিছানা-পত্র সঙ্গে লইতে দেখি নাই। নিজ 'জায়নামাজ' খানা কোমরে বাঁধিয়া এবং অজু ইত্যাদির জরুরতের জন্য একটি কেত্লী নিজ হাতে করিয়া ষ্টীমারে উঠিয়াছেন এবং সেখানে জায়নামাজ বিছাইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন; আবার নামিবার সময় কোমরে জায়নামাজ বাঁধিয়া এবং কেতলীটি হাতে করিয়া নামিয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য আমরা ফাঁকে ফাঁকে একটু খেদমত না করিয়াছি এমন নয়। টিকেট খরিদ করিয়া দিয়াছি; সময়ে খাবার খরিদ করিয়া আনিয়া দিয়াছি।

সেই অসম্ভব ভীড়ের সভায় স্বভাবতঃই মানুষ একটু আশ্রয় খোঁজে, একটু নিরিবিলি জায়গা অনুসন্ধান করে। আমাদের পীর ছাহেব ইচ্ছা করিলে তাহা তিনি অবাধেই পাইতেন; কিন্তু, তিনি উহা কোনও দিনই চাহেন নাই, বরং কেহ সেরূপ সুযোগ দিতে চাহিলে তাহা প্রত্যাখান করিয়াছেন। তিনি মোর্শেদের বাড়ীর অঙ্গনে ধূলায় ধুসরিত মাঠে একটি না জানি জীর্ণ আম গাছের ততোধিক শীর্ণ ছায়ায় কম্বল পাতিয়া বসিয়া পড়িতেন, আবার সভা সমাপ্ত হইয়া গেলে সেখান হইতে উঠিয়া কম্বল ঝাড়িয়া পীরের অনুমতি চাহিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতেন।

পীরের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা পীরের সহিত নিজ নিজ ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন বিশিষ্ট খলিফাগণ সেই রাজর্ষীর চতুষ্পার্শ বেষ্টন করিয়া এক রাজ-দরবারের সৌষ্ঠব সৃষ্টি করিতেন, এবং তাঁহারা উহার অঙ্গীভূত হইয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেন, কতো আলোচনা উত্থাপন ও কতো সমস্যার সমাধান করিতেন; কিন্তু আমাদের হুজুর, সেই ধীর, গম্ভীর, আত্ম-সমাহিত ও আত্ম-বিস্তৃত হুজুর সেখানে থাকিতেন না। তিনি দূরে, দৃষ্টি সীমার বাহিরে যেন আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়াছেন। বিনা আহ্বানে, বিনা প্রয়োজনে, পীরের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে তিনি রীতিমতো ভয় করিয়াছেন, আদবের বহির্ভূত মনে করিয়াছেন। কারণ, তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার পীর যুগের

মুজাদ্দেদ এবং ছুলতানুল আওলিয়া ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মোর্শেদ তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেন না। কোনও অনুষ্ঠান কিংবা কোনও প্রস্তাবনা উপস্থিত হইলে, তদীয় মোর্শেদ তাঁহাকে নিজেই ডাক দিতেন, লোক প্রেরণ করিয়া আনাইতেন, তাঁহাকে অনুষ্ঠানে শরীক করিতেন, এবং যথোপযুক্ত পদ ও মর্য্যাদা দান করিতেন। আমাদের পীর ছাহেব উহাতে উৎসাহিত হইতেন বলিয়া মনে হইত না। তিনি নিজ পীরের দরবারে নিজ মর্য্যাদাকে রীতিমতো ভয় করিতেন এবং যথা সম্ভব উহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

ফানা ফিশ্-শায়খের অবস্থা হুজুরের অতি উঁচু পর্য্যায়ের লাভ হইয়াছিল। হুজুর একদা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "তিনি কলিকাতা চাঁদনী চকের মছজিদে বসিয়া মোরাকাবা করিতেন! হুজুরের মোর্শেদ কেব্‌লা মছজিদের পূর্ব্ব দিকে কোনও কামরায় তশরীফ রাখিতেন। আমাদের পীর ছাহেব মছজিদে বসিয়া নিজ পীর কেবলার দিকে মুখ করিয়াই মোরাকাবা করিতেন। ইহাতে অন্যান্য মুরীদগণের ভিতরে গুঞ্জন শুরু হইল। পীর ছাহেব পশ্চিম মুখীন না হইয়া তখন কেন পূর্ব্বমুখীন হইয়া মোরাকাবা করিতেন ইহা একটি আলোচনা এবং শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা হইতে হুজুরের পীর কেবলার দরবার পর্য্যন্ত পৌঁছিল। ইহার কারণ তদীয় পীর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেন। আমাদের পীর ছাহেব উত্তর দিলেন "হুজুর যে পিছনে থাকেন!" তদীয় পীর বলিলেন "কেন বাবা! দেয়াল তো রয়েছে!" আমাদের

পীর ছাহেব বলিলেন "আমি তো দেয়াল দেখিনা হুজুর!" এই উত্তরের পর তদীয় পীর কেব্‌লা আর কিছু বলিয়াছিলেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। সম্ভবতঃ প্রতিবাদকারীরা ইহা হইতে একটি শিক্ষাই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

এই জীবনীর প্রথম ভাগে উল্লেখ করিয়াছি যে, পীর ছাহেব একবার এদেশ হইতে হেজরতের ধারণায় মক্কা-শরীফ গিয়াছিলেন, সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে সেই বস্ত্রেই নিজ পীর সন্দর্শনে গিয়াছিলেন।

পীর ছাহেব নিজ ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা সামাজিক যে কাজ করিতে ইচ্ছা করিতেন, উহা তদীয় পীর কেবলার এজাজত নিয়াই করিতেন। তিনি নিজ বাড়ীতে মাদ্রাছাহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে পীরের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং উহার জন্য এমারৎ নির্ম্মাণ কালে তিনি নিজ মোর্শেদের হাতেই উহার ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। একটি "ফতোয়া' সঙ্কলন করিলে উহা প্রচারের পূর্ব্বে তিনি নিজ পীরের গোচরে নিতেন এবং শুনাইতেন; অতঃপর অনুমতি দিলে প্রচার করিতেন। একখানা কেতাব প্রণয়ন করিলেও তাহা নিজ পীরকে শুনাইতেন, তাঁহার দস্তখত বা মৌখিক অনুমতি গ্রহণ করতঃ মুদ্রিত করিতেন। ফুরফুরা শরীফ কিংবা কলিকাতা হইতে এইরূপ অনুমতি আনা

নেওয়ায় বহু অর্থ ব্যয় হইয়া যাইত, কিন্তু উহাতে তিনি কিছু মাত্র দুঃখিত হইতেন না।

ফুরফুরার মরহুম পীর ছাহেব কেব্‌লার বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ ফতোয়া প্রচার করিয়াছেন। আমাদের পীর ছাহেব উহার প্রতিবাদে বহু সময় এবং অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। রদ্দে বদগুমান মাওলানার উক্তি খণ্ডন, প্রভৃতি পুস্তিকাগুলি উহার প্রমাণ। উক্ত কেতাবে মুদ্রিত ফতোয়াগুলি সঙ্কলন করিতে এবং উহাতে দেশ বিদেশের আলেমদের দস্তখত করাইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

নিজ পীরের সন্তুষ্টি বিধানার্থে খাদ্য-খাদক, ফল মূল, ও টাকা পয়সা প্রচুর পরিমাণ হাদিয়া স্বরূপ দিতেন।

জীবনের গভীর কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও নিজ পীরকে তিনি বিস্মৃত হন নাই। পীর যতদিন জীবিত ছিলেন, ততোদিন নিজকে পীরের নিকট একজন অতি সাধারণ মুরীদ হিসাবেই গণ্য করিয়াছেন। হুজুরের পীর কেব্‌লা যখন এন্তেকাল করেন, তখন তিনি রীতিমতো বৃদ্ধ একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বনাম খ্যাত কামেল পীর। তথাপী তিনি তাঁহার পীরের এন্তেকালে পিতৃ-হীন শিশুর মতোই রোদন করিতেন এবং নিজকে একান্ত অসহায় ভাবিতেন। তিনি প্রায়ই এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন; "হুজুর চলিয়া গিয়াছেন, ইয়াতিম হইয়া গিয়াছি, এখন কাহার নিকট যাইব!" বলিতে বলিতে দুই চক্ষু পানিতে ডুবিয়া যাইত;

আমরা যাহার সম্মুখে থাকিতাম, বিহ্বল কাতর নেত্রে হুজুরের চেহেরার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম।

পীর ছাহেব শুধু তাঁহার পীরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। পীরের সহিত সম্পর্কিত জনকেও তিনি যথোপযুক্ত সম্মান ও ভক্তি করিতেন। পীরের সন্তানগণ সম্ভবতঃ সকলেই আমাদের পীর ছাহেবের বয়োঃকনিষ্ঠ হওয়া স্বত্ত্বেও তাঁহাদের সকলকেই পীরের সমতুল্য জ্ঞান করিতেন এবং সেইরূপ সমীহ ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সম্পর্ক বা বয়েসের বিচারে তাঁহাদের সহিত ক্ষণিক সমতুল্যতার ব্যবহার অস্বাভাবিক মনে হইবার কারণ ছিল না, তাই তিনি কোনও দিন পীর জাদাগণের সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতে সাহসী হন নাই। তিনি চিরদিনই পীরজাদাগণের সহিত আদব ও সম্মানের ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের কাহারও সাক্ষাৎ ঘটিলে সসম্মানে দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং অনুগত জনের ন্যায় সংযত ভাবে আলাপ আলোচনা করিতেন; এমন কি, তাঁহাদের বিছানায় পর্য্যন্ত উপবেশন করিতেন না। শুধু তাহাই নহে, পীর ছাহেবের মোর্শেদ কেবলার এন্তেকালের পর তদীয় পীর ভাইগণের প্রতি অধিক তীক্ষ্ণ ও সজাগ রাখিতেন এবং অপরের দ্বারা তাঁহারা কোনও-রূপ নিগ্রহ ভোগ না করেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতেন। পীর ছাহেব তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পীর কেবলার সন্তান ও সম্পর্কিত জনের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

মোর্শেদের অগাধ স্নেহ মমতা লাভ

পীর ছাহেব কেবলার ন্যায় এরূপ গুণান্বিত একটি মুরীদের প্রতি তদীয় পীর যে কিরূপ স্নেহ পরবশ হইবেন তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। বস্তুতঃ পীর ছাহেবের মোর্শেদ এই একান্ত ভক্ত ও গুণ মণ্ডিত খলিফাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহ ও করুণা বর্ষণ করিতেন। গোচরে, অগোচরে তিনি তাঁহার এই খলিফাটির যোগ্যতা ও কামালিয়াতের কথা সাধারণ্যে জানাইয়া দিতেন এবং তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়া দিতেন। তিনি বড়ো বড়ো জনসভার মধ্যেও পীর ছাহেবের যোগ্যতার কথা ঘোষণা করিয়া দিতেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহুলোক মুরীদ হইবার জন্য ফুরফুরা শরীফে গমন করিতেন। তাঁহাদের অনেকেই তওবা বাইয়াৎ করাইয়া বলিয়া দিতেন: আপনাদের দেশে পীর রহিয়াছে, তাঁহার নিকট যান, আমার নিকট আসিতে হইবে না। এই ভাবে বরিশাল ও পার্শ্ববর্ত্তী জিলার লোকদিগকে আমাদের পীর ছাহেবের নিকট তরিকা শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। পীর নিজ মুরীদের যোগ্যতার সংবাদ রাখেন। ফুরফুরার হজরত পীর কেবলা, তাঁহার নিজ হস্তে গড়া মুরীদের কামালিয়তের খবর তাঁহার নিকট গোপন থাকিবার কথা নহে। তাই তিনি নিজ মুরীদ হইলেও মুরীদের যোগ্যতার কদর করিতেন।

এমন কি, স্নেহের আতিশয্যে সময়ে নিজের এই মুরীদটির উপস্থিতিতে নিজ আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সস্নেহে, ও সহাস্যে আগু বাড়াইতেন।

ফুরফুরার বার্ষিক ইছালে ছওয়াবের মাহ্‌ফিলে প্রায় সকল প্রধান খলিফাই প্রতি বৎসর হাজীর হইতেন। সভায় কাহারও জন্য থাকিবার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। কতো লোক! ইহাদের জন্য দুই দিবস ব্যপী একটি সভায় কাহারও জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থার প্রশ্নই উঠিত না। আর পীরের বাড়ীতে উহা কেহ দাবী করিবার হিম্মৎ রাখেনা। কাজেই যিনি যেমন পারিতেন, নিজ পীরের পুণ্য আস্তানায় থাকিয়া যাইতেন। আমাদের পীর কেবলার কথাও আপনারা ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন যে, তিনিও যেখানেই স্থান পাইতেন সেখানেই থাকিতেন কিংবা বাহিরেই অবস্থান করিতেন।

একবারের ঘটনা শুনুন। সেই বৎসর ফুরফুরার পীর কেবলা শর্ষিনা তশরীফ আনিয়াছিলেন। উহাই ছিল তাঁহার শেষ শর্ষিনা আগমন। সেবার বিরাট আয়োজন, বিপুল খরচ এবং অগনিত লোক সমাগম হইয়াছিল। ইহা সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ মাসের কথা! আমাদের পীর ছাহেব সেই বৎসর ফুরফুরার ইছালে ছওয়াবে না যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। হুজুর ভাবিয়াছিলেন, "হুজুরকে এবার বাড়ীতে আনিয়া সভা-সমিতি করা হইল, এবার ফুরফুরা যাইবার

সুযোগ করা সম্ভব হইবে না। এমন কল্পনা হয়তো তিনি জীবনে আর কোনও দিনই করেন নাই; কিন্তু সেবার এইরূপ মনে মনে ধারণা করিয়াছিলেন।

ফুরফুরার হুজুর কেব্‌লা শনিনা হইতে বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আমাদের পীর ছাহেবকে বলিলেন "বাবা, আমার ইছালে ছওয়াবে যাবেন কিন্তু; আপনার অবশ্য সেখানে কষ্ট হয়; এবার আপনার জন্য একটা কামরা তৈরী করেছি, সেখানে থাক্‌বেন।" অবশ্য এমন তরো আহ্বান নিজ পীরের তরফ হইতে আর কোনও দিনই আসে নাই।" পীর ছাহেব নিজ আভ্যন্তরীণ সঙ্কোচের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইলেন।

হুজুর সেইবার ফুরফুরা শরীফ গেলেন, আমরাও কয়েকজন সঙ্গে গেলাম। কদমতলা হইতে মার্টিন কোম্পানীর ছোট গাড়ীতে করিয়া যাইতে হইত। অসংখ্য যাত্রী, নিদারুণ ভীড়। অগণিত যাত্রী সেই গাড়ী গুলির কামরা এবং ছা'দ পা, দানীতে ঠাঁসাঠাসী করিয়া যাইতেছে। আমরাও পীর ছাহেবকে সঙ্গে করিয়া সেইরূপ একটি গাড়ীতে অসম্ভব ভীড়ের মধ্যে রওয়ানা হইয়াছি। পথিমধ্যে হইতে মাওলানা মরহুম রুহোল আমীন ছাহেব এবং আরও কেহ কেহ মোটর যোগে যাইতেছিলেন। তাঁহারা আমাদের পীর ছাহেবকে মোটরে সঙ্গী করিয়া লইলেন ভীড়ের দুর্গতি হইতে অব্যাহতি দিলেন।

আমরা শেষ ষ্টেশনে পৌছিয়া তৎপর গো-শকটে ফুরফুরা পৌছিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আমরা ফুরফুরা পৌছিয়া পীর ছাহেবকে মছজিদের সংলগ্ন একটি কামরায় দেখিতে পাইলাম। একটু পরেই সেখানে ফুরফুরার হুজুর কেবলা মছজিদের সংলগ্ন বারান্দার উত্তর দিকে প্রাচীর ঘেষিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদের পীর ছাহেবকে মধুর শব্দে ডাক দিলেন। আমাদের পীর ছাহেব 'হুজুর' বলিয়া অতি ধীরে এবং বিনীতভাবে নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া গেলেন। বাহির হইতে ফুরফুরার হুজুর কেব্‌লা বলিতেছিলেন "বাবা আপনার এখানে থাকার বড়ো অসুবিধে হইত, তাই আপনার জন্য মছজিদের সঙ্গে এই আমরা টুকু তৈয়ার করিয়াছি, ছাদটা বাকী আছে। আপনি এখানে এখন থেকে থাকবেন আর কেউ নয়। আর আপনার জন্যে বাড়ীর ভিতর থেকে বিছানা আনতে দিয়েছি"। পরে দেখিলাম, একখানা কি দু'খানা হাতে সেলাই করা কাঁথা পীর ছাহেবের কামরায় বিছানো রহিয়াছে। উল্লিখিত কথোপকথন প্রসঙ্গে কিংবা তার খানিক পরে ঠিক স্মরণ করিতে পারিনা, ফুরফুরার হুজুর কেবলা আমাদের পীর ছাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বাবা, আকাশে মেঘ হচ্ছে, আপনি ফুরফুরাকে হেছার (বেষ্টন) করে একটু দোওয়া করুন, যেন মেঘটা বাইরে থেকে যায়"। সেই সভার সময় বর্ষা হইলে অগনিত লোকের বিশেষ কষ্ট হইত। যাই হোক, ইহার তাৎপয্য বিশ্লেষণ করিয়া লাভ নাই। যে যেমন ইচ্ছা, ইহার ব্যাখ্যা করিয়া লইতে পারেন।

এই বৃদ্ধ তাপস প্রবর নিজ মুরীদের জন্য একটি কথা মনের কোনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি জীবন শেষে তাঁহার এই মুরীদটি সম্পর্কে মনের গোপন কথাটি অতি সতর্কতার সহিত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

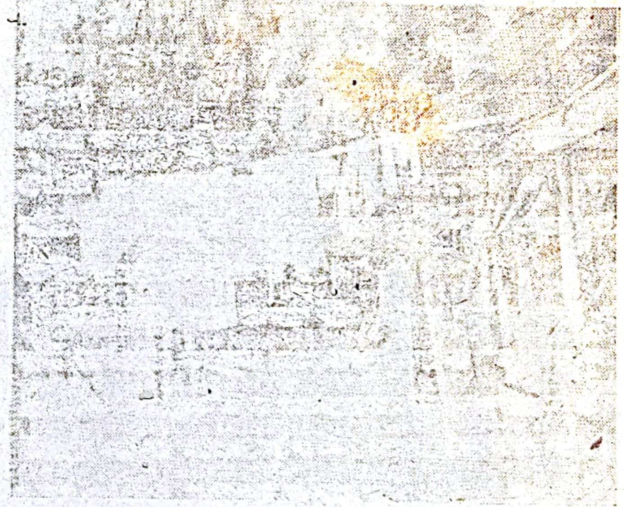
ফুরফুরার পীর ছাহেব কেবলা তখন কলিকাতা হালদার লেনে অবস্থান করেন। সেই সময় একদা পত্রযোগে শর্ষিনার পীর ছাহেবকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিলেন। তিনিও ঘটনাচক্রে তখন নিজ বাড়ীতে অসুস্থ। তিনি অসুখ সাড়িয়া উঠিতেই অবিলম্বে নিজ পীরের সন্নিধানে কলিকাতা চলিয়া গেলেন। সঙ্গে মৌঃ এমদাদ আলী ছাহেব এবং তদীয় বড়ো ছাহেব জাদা মাওলানা শাহ আবু জাফর শাহ মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব গেলেন। পীর ও মুরীদের সাক্ষাতের স্বাভাবিক আদান প্রদান হইল।

পীর ছাহেবকে সেখানে বিশ্রাম করিবার জন্য একটি কামরার দিকে নির্দ্দেশ করিলেন। আমাদের হুজুর সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে তদীয় পীর তনয় হজরত মাওলানা আবদুল কাদের (মরহুম) ছাহেবের শয্যা পাতা রহিয়াছে। পীর ছাহেব আদবের খাতিরে সেই বিছানায় উপবেশন করিলেন না।

এই কথা তদীয় পীর কেবলার অজ্ঞাত থাকিল না। পরে যখন পুনরায় পীর মুরীদের মধ্যে কথোপকথন শুরু হইল তখন মোর্শেদ প্রবর প্রথমেই বলিতে লাগিলেন "বাবা! লোক তিনটি কাজ দ্বারা কামালিয়ৎ লাভ করিতে পারে:

তন্মধ্যে একটি হইতেছে আমল, একটি আদব এবং আর একটি এলম। এর ভিতরে আদবই হইতেছে প্রধান!" কথাটি আমাদের পীর ছাহেবের আদবের প্রতি যে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল সেই কথার স্বীকৃতি বলিয়াই ধারণা করিবার কারণ রহিয়াছে।

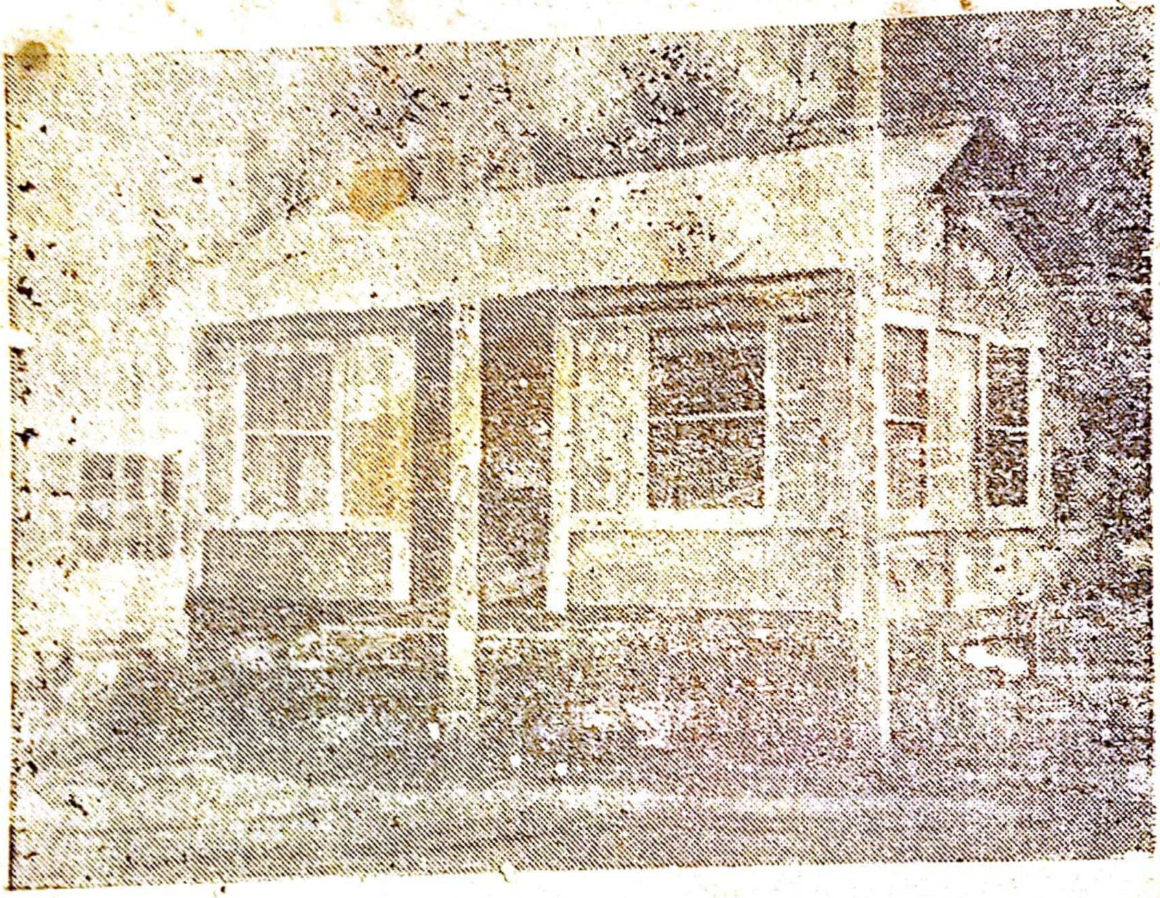
অতঃপর মোর্শেদ প্রবর তদীয় মুরীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে বলিলেন" হজরত রছুলে করিম দঃ এর কত সংখ্যক



ছবিতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার ব্যবহৃত কয়েকটি জামা পাজামা ও পাগড়ী ইত্যাদি দেখা যাইতেছে।

ছাহাবী ছিলেন? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি নিজেই আবার বলিলেন—লক্ষাধিক ছাহাবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রাঃ হজরত ওমর ফারুক রাঃ হজরত ওছমান গণী

রাঃ ও হজরত আলী কঃ ছিলেন প্রধান। আবার এই চারিজনের মধ্যে হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রাঃ প্রধান ছিলেন। আবু হজরত বকর ছিদ্দিক রাঃ এর সঙ্গে রছুলের করিম দঃ এর যে নেছবৎ ছিল; আপনার সহিত আমার নেছবৎ ও



নীচের ছবিতে পীর ছাহেবের প্রধান কর্ম্মী ও জীবন সহচর, দারুছুন্নাতের একনিষ্ঠ সেবক ও সংগঠক মৌলবী এমাদাদ আলী ছাহেবের বিশ্রাম কুটিরটি দেখা যাইতেছে।

তদ্রূপ"। সেদিনকার মতো ইহাই ছিল উল্লেখযোগ্য কথাবার্ত্তা। সেই বারের সাক্ষাৎকারে আর আর কোনও বিশেষ কথা আলোচনা হয় নাই। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মোর্শেদ প্রবর তাঁহার জীবন শেষে আমাদের পীর ছাহেবকে এই কথাটি জানাইয়া দিবার জন্যই বিশেষভাবে ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন।

সমাপ্ত